ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল

শাহ আবদুল হান্নান

ইসলামী অর্থনীতি
দর্শন ও কর্মকৌশল

শাহ্ আবদুল হান্নান

আল আমীন প্রকাশন

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল

শাহ্ আবদুল হান্নান

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০২

প্রকাশক
মুহাম্মদ মীজানুর রহমান
আল আমীন প্রকাশন
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স
বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ৯০০৬১৯১

প্রচ্ছদ
মোবাশ্বির মজুমদার

অঙ্গসজ্জা
আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর

কম্পিউটার কম্পোজ
শামসুল হুদা (সোহেল), সিদ্দিকুর রহমান
১৫ সি/৮, ব্লক-এফ, হাজী চিনু মিয়া রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮১২৫১৮৮

মুদ্রণ
এ্যানজেল প্রিন্টার্স লি.
২৮ নতুন আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-819 - 005-8

মূল্য : ৯০ টাকা

Islami Orthonity : Darshan O Karmakaushal [Islamic Economics : Philoshophy & Strategy]. Written by **Shah Abdul Hannan.** Published in April 2002, by Muhammad Mizanur Rahman, **Al-Ameen Prokashon,** 38/3 Computer Complex, Bangla Bazar, Dhaka, Bangladesh. Tel : 9006191
Price : Tk. 90.00 [US $ 5]

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

অর্থ মানব জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও মানুষ অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত নয়। প্রচলিত অর্থনীতি আর ইসলামী অর্থনীতি যে এক নয়- এ বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞানও অনেকের নেই। বিশ্বগ্রামের বর্তমান অনেক বনী আদম ইসলাম এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার নামে নাক সিটকায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির আজকের বিশ্বে ইসলামী সমাজব্যবস্থার কথা কেউ বললেই মধ্যযুগীয় বলে গালমন্দ শোনাই ভাগ্যে জোটার কথা। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম ঘোষণা করা সত্ত্বেও মানুষ জেনে-বুঝে সুদী লেন-দেনের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে, অথবা জড়াতে বাধ্য হচ্ছে। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কল্যাণ রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে যুগ যুগ ব্যাপী সুদের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করেন। কুরআনের আদলে তিনি আর পাঁচটি বিষয়ের ন্যায় অর্থ ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজান। বিজ্ঞানের অগ্রগতির এই আধুনিক বিশ্বের মানুষ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে চায়। সেহেতু বিশ্বে আজ ইসলামী অর্থনীতির স্লোগান উচ্চকিত হচ্ছে। প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অত্যন্ত সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের মানুষও ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে চান। দেশে ইসলামী অর্থনীতির উপর কিছু কাজও হয়েছে। তবে আরো কাজের প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রেক্ষিতেই এগিয়ে আসেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক শাহ আবদুল হান্নান। জনাব আবদুল হান্নান এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি স্বচক্ষে অনেক উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশ্বের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাওয়া নিয়ে। জীবনব্যাপী সরকারী গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের সুবাদে অনেক কিছুই তাঁর নখদর্পণে। মেপে মেপে যেমনি তিনি কথা বলেন, তেমনি লেখেনও শব্দ বাজিয়ে। কেউ এতটুকু আঘাত পাক-তেমন সাহিত্য জনাব আবদুল হান্নান রচনা করেন না। তিনি পরামর্শে বিশ্বাসী। যা-ই লিখবেন, বন্ধু-বান্ধব এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ করে তবেই ক্ষান্ত হবেন। সময়ের প্রয়োজনে তিনি কথা বলেন, বক্তৃতা করেন, বিবৃতি দেন, লেখেন দু'হাতে। অধ্যবসায়ই তাঁর জীবনের ব্রত। দেশ-বিদেশের বরেণ্য মনীষীদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে দেশ জাতি এবং মিল্লাহকে গাইড লাইন দিয়ে তিনি লিখে চলেছেন অবিরত।

বর্তমান গ্রন্থে যুক্তির কষ্টিপাথরে পরখ করে তিনি ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংক ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করেছেন আকর্ষণীয়ভাবে। সমাজকে সংস্কারের জন্য

www.pathagar.com

তাঁর যুক্তির মধ্যে কোনো ধরনের ঋজুতা নেই। আহবানের মধ্যে নেই কোনো গোঁজামিল। সাদাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলে চিহ্নিত করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। এ ধারাবাহিকতায় বর্তমান গ্রন্থ নিঃসন্দেহে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মাইলফলক।

ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল শিরোনামে তিনি মূলধারায় গিয়ে তবেই আলোকপাত করেছেন। দেশ-বিদেশের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, গ্রন্থরাজি এবং লেখালেখির উল্লেখ এবং উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তিনি আমাদের সমাজে যে সব বিষয় এখনো সমন্বিত হয়নি, সে ব্যাপারে দিক-নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে সাধারণ পাঠককে দিয়েছেন সম্যক জ্ঞানের দিক-নির্দেশ। কুরআনের অর্থনীতি সংক্রান্ত আয়াতগুলো একে একে উপস্থাপন করে বিশ্ববরেণ্য তাফসীরের নিরিখে তিনি করেছেন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

গ্রন্থকারের হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় *ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল, ইসলামী অর্থনীতি : প্রয়োগ ও বাস্তবতা, ইসলামী অর্থনীতি ও তার বাস্তবায়ন, ইসলামী অর্থনীতি: কিছু দিক, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক ভূমিকা, বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট : অংশীদারিত্ব ব্যাংকিংই একমাত্র সমাধান*- এসব বিষয় ব্যাখ্যায়িত হয়েছে সফলভাবে। এছাড়া তিনি *আল কুরআনে অর্থনীতি* শিরোনামে আমানতের খেয়ানত; পরিবারের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; ইয়াতীম এবং নারীদের সমস্যা ও অধিকার; কালালা'র সম্পত্তি বন্টন; পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব; কতিপয় নিষিদ্ধ কাজ : অর্থনৈতিক তাৎপর্য; অপব্যয়; সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষার সামগ্রী; অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা; খিলাফতের অর্থনৈতিক তাৎপর্য; নূহ (আ)-এর যুগের সামাজিক চিত্র; সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা; সৎপথে ব্যয়; সম্পদ বন্টন সম্পর্কিত আল্লাহর নীতি; কালেমা তাইয়্যেবার অর্থনৈতিক তাৎপর্য; আল্লাহর নিয়ামতের অপরিমেয়তা; জন্তু-জানোয়ারের উপকার; সম্পদের ব্যয়; সমুদ্রে যোগাযোগ ও আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান; আল্লাহর আনুগত্য; ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো; আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ও নিয়ামত; আল্লাহর সার্বভৌমত্ব; বিয়ে; আল্লাহই রিযিকদাতা; আল্লাহর অনুগ্রহশীল ব্যক্তি; আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি; তওবার পর নিয়ামত দান; অভাবগ্রস্তদের দুঃখ দূর করা- এসব বিষয় বিশ্ববরেণ্য তাফসীর, বিশুদ্ধ হাদীস এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে অর্থনীতির আলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

এ ধরনের গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ করে ইকোনমিক লিটারেচারকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করবে। ইসলামী অর্থনীতি এবং ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষকদের জন্য এ গ্রন্থ দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে। আশা করি, গ্রন্থটি পাঠ করে সর্বশ্রেণীর মানুষ উপকৃত হবেন। গ্রন্থটি পাঠক নন্দিত হবে- এটাই আমাদের বিশ্বাস।

মুহাম্মদ মীজানুর রহমান

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলামী অর্থনীতির উপর আমার প্রথম বই *ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা* ১৯৮৫ সালে বের হয়। এর দীর্ঘ সময় পর আবার নতুন করে বিভিন্ন সময়ে লিখিত এবং পত্রিকায় প্রকাশিত ইসলামী অর্থনীতির উপর আমার লেখা থেকে কয়েকটি প্রবন্ধ একত্র করে *ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল* নামে বের হলো।

ইসলামী অর্থনীতিতে দর্শন ও কর্মকৌশল (Strategy) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্পর্কিত বইয়ের সংখ্যাও কম। যার ফলে এই প্রেক্ষিতেই এই পুস্তকের পরিকল্পনা করা হয়। এই গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতির উপর যে সমস্ত প্রবন্ধ রয়েছে তার মধ্যে *ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল* এবং *ইসলামী অর্থনীতি : প্রয়োগ ও বাস্তবতা* প্রবন্ধ দু'টি ইসলামী অর্থনীতির দর্শন ও প্রয়োগ সংক্রান্ত। অন্যদিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর *আল কুরআনে অর্থনীতি* প্রকল্পের আওতায় দুই খন্ডে যে *আল কুরআনে অর্থনীতি* নামক গ্রন্থ বের হয় তাতে একজন সদস্য হিসেবে আমারও বেশ ক'টি লেখা ছিল। আমার সেই লেখা ক'টিও এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে। কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পরবর্তীতে রিসার্চের জন্য কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া এখানে ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে।

এই বই বের করতে যারা আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে আমি তাদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এর মধ্যে সর্বাধিক সাহায্য করেছে ড. আবদুল ওয়াহিদ ও প্রিয় সুজন ওমর বিশ্বাস। এই বইটি প্রকাশের জন্য প্রকাশক মুহাম্মদ মীজানুর রহমানকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি আশা করি, আমার এই গ্রন্থ সকলের উপকারে আসবে।

শাহ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

সূচি

ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল ৯
ইসলামী অর্থনীতি : প্রয়োগ ও বাস্তবতা ১৮
ইসলামী অর্থনীতি ও তার বাস্তবায়ন ২৭
ইসলামী অর্থনীতি : কিছু দিক ২৯
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক ভূমিকা ৪২
বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট : অংশীদারিত্ব ব্যাংকিংই একমাত্র সমাধান ৪৬

আল কুরআনে অর্থনীতি

- আমানতের খেয়ানত প্রসঙ্গে ৫৩
- পরিবারের ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গে ৫৫
- ইয়াতীম এবং নারীদের সমস্যা ও অধিকার সম্পর্কে ৬১
- কালালা'র সম্পত্তি বন্টন প্রসঙ্গে ৬৩
- পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে ৬৫
- কতিপয় নিষিদ্ধ কাজ : অর্থনৈতিক তাৎপর্য ৬৮
- অপব্যয় সম্পর্কে ৭৩
- সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষার সামগ্রী ৭৭
- অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা প্রসঙ্গে ৮০
- খিলাফতের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে ৮৩
- নূহ (আ)-এর যুগের সামাজিক চিত্র ৮৬
- সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রসঙ্গে ৮৯
- সৎপথে ব্যয় প্রসঙ্গে ৯৩
- সম্পদ বন্টন সম্পর্কিত আল্লাহর নীতি প্রসঙ্গে ৯৫
- কালেমা তাইয়্যেবার অর্থনৈতিক তাৎপর্য ৯৮
- আল্লাহর নিয়ামতের অপরিমেয়তা প্রসঙ্গে ১০২
- জন্তু-জানোয়ারের উপকার প্রসঙ্গে ১০৪
- সম্পদের ব্যয় প্রসঙ্গে ১০৭

www.pathagar.com

- সমুদ্রে যোগাযোগ ও আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে ১১৪
- আল্লাহর আনুগত্য প্রসঙ্গে ১১৬
- ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে ১১৮
- আল্লাহর আনুগত্য সম্পর্কে ১২২
- আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ও নিয়ামত প্রসঙ্গে ১২৫
- আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে ১২৭
- বিয়ে প্রসঙ্গে ১২৯
- আল্লাহই রিযিকদাতা ১৩৩
- আল্লাহর অনুগ্রহশীল ব্যক্তি সম্পর্কে ১৩৫
- আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে ১৩৮
- তওবার পর নিয়ামত দান প্রসঙ্গে ১৪০
- অভাবগ্রস্তদের দুঃখ দূর করা প্রসঙ্গে ১৪২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল

ইসলামী অর্থনীতি বর্তমানে একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, অর্থনীতি সাবজেক্টের বয়সও খুব বেশী নয়। মাত্র সত্তর বা আশি বছর। এর পূর্বে এটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন এটাকে পলিটিক্যাল ইকোনমি (Political Economy) বলা হতো।

গত পঞ্চাশ বছর ধরে ইসলামী অর্থনীতির উপর ব্যাপক কাজ হচ্ছে। বেশ কিছু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সিনিয়র অর্থনীতিবিদ এই বিষয়ে কাজ করেছেন- এদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ড. নাজাত উল্লাহ সিদ্দিকী, প্রফেসর ড. ওমর চাপরা, ড. মনজের কাহাফ, ড. তরিকুল্লাহ খান এবং ড. মুনাওয়ার ইকবাল। এ ছাড়াও অন্যান্য স্কলাররা এই বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন। আস্তে আস্তে ইসলামী অর্থনীতি একটি পূর্ণ বিজ্ঞানে (Science) পরিণত হয়েছে।

আমি ইসলামী অর্থনীতির উপর আলোচনা করতে গেলে এই ইসলামী অর্থনীতির যে দর্শন বা স্ট্র্যাটেজি সেই বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। ইসলামী অর্থনীতির দর্শন হলো এই অর্থনীতির ভিত্তি অথবা তার স্ট্র্যাটেজির ভিত্তি বা কর্মকৌশলের ভিত্তি। কেননা, একটি বিল্ডিং যেমন নির্ভর করে তার ফাউন্ডেশনের উপরে, ফাউন্ডেশনটাই বলে দেয় বিল্ডিংটি কি রকম হবে, তেমনিভাবে ইসলামী অর্থনীতির দর্শন বলে দেয় যে, তার স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে বা কি হওয়া উচিত।

কিন্তু সেই দর্শন এবং কর্মকৌশল আলোচনার পূর্বে আমি মনে করি বর্তমান বিশ্বে যা চলছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধিক চলিত (Ruling) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে ক্যাপিটালিজম (Capitalism)। যদি এই ক্যাপিটালিজমের সমস্যাগুলো বুঝতে পারি তাহলেই আমরা ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্ব বুঝতে পারব। এটা এই জন্যেই প্রয়োজন যে, বর্তমান রুলিং আইডিওলজি (Ruling Ideology) দৃশ্যত খুব শক্তিশালী, খুব সফল বলে মনে হয়। অনেকের এও মনে হতে পারে যে, এর বুঝি কোনো দুর্বলতা নেই। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয় এবং এ কথাটাই আলোচনা করতে চাই।

প্রথমত, আমি এ কথা বলতে পারি, ক্যাপিটালিজমের বয়স ষোড়শ শতাব্দী থেকে ধরা হয়। প্রায় পাঁচশ' বছর এর বয়স। এই পাঁচশ' বছরে ক্যাপিটালিজম যে দুনিয়ায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে তা অস্বীকার করা যাবে না। তেমনিভাবে

www.pathagar.com

এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, ক্যাপিটালিজম দারিদ্র্য (Poverty) দূর করতে পারেনি। বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য, অসমতা (Unequality) দূর করতে পারেনি। কাজেই, ক্যাপিটালিজম দোষমুক্ত বা সমস্যামুক্ত এটা যেমন অতীতের ক্ষেত্রে বলা যায় না, তেমনি আজকেও বলা যায় না। আজকেও আমরা লক্ষ্য করছি এই মুহূর্তে অর্থাৎ ২০০২ সালে জাপানের অর্থনীতির মধ্যে একটা নিম্নগতি (downturn) ধারা, আর্জেন্টিনাতে দেখতে পাচ্ছি বিরাট অর্থনৈতিক সংকট। সেখানে অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে গত পাঁচ-ছয় মাসে চারজন প্রেসিডেন্ট বদল হয়ে গেছেন এবং সেখানে বিরাট ক্রাইসিস চলছে।

আমরা গত পনের বিশ বছরে পুঁজিবাদী বিশ্বের অনেক সংকট দেখেছি। সাউথ ইস্ট এশিয়ার বিরাট অর্থনৈতিক ক্রাইসিস দেখলাম বিগত শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে এবং সেটা এখনো চলছে। ল্যাটিন আমেরিকাতেও আমরা বিভিন্ন সময় ক্রাইসিস দেখেছি। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতেও আমরা ডাউন টার্ন লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন সময়ে। এ সম্পর্কে অনেক কথাই বলা যায়।

আমি মনে করি, ক্যাপিটালিজমের উপর একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা হওয়া দরকার। ক্যাপিটালিজম আমরা কম বেশী সবাই বুঝি। এই প্রসঙ্গে আমি এটা বলে দেই, এই সব অর্থনৈতিক মতবাদ প্রধানত পাশ্চাত্যেই তৈরী হয়েছে এবং ডেভেলপ করেছে। পাশ্চাত্যের পন্ডিতরাই এর উপর বেশী কাজ করেছেন। এটাও ঠিক যে, এই কথাগুলো শুধু ক্যাপিটালিজমের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, সোস্যালিজমের ক্ষেত্রেও সত্য। ওয়েলফেয়ার ইকোনমিকস্ (Welfare Economics) নামে যা বিশ্বে চলছে, সেটাও পাশ্চাত্যেরই অবদান। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরাই এই সমস্ত ধারণা নিয়ে আসছেন।

ক্যাপিটালিজমের ভিত্তি ছিল বা এর পেছনে শুরুতে কাজ করত খৃস্টান এথিকস বা খৃস্টান নৈতিকতা। কারণ পাশ্চাত্যের যেখানে এর ডেভেলপমেন্ট হয় সেই সমাজ মূলত খৃস্টান ছিল। মৌলিকভাবে জনগণ খৃস্টীয় এথিকসে বিশ্বাস করত। ফলে ক্যাপিটালিজমের অর্থনৈতিক নীতিমালায় যাই ত্রুটি থাকুক না কেন খৃস্টান এথিকস তাকে মডারেট করত, তার খারাপ প্রভাবকে সংযত করত, তাকে কন্ট্রোল করত।

পরবর্তীকালে যে ঘটনা ঘটল- অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুক্তবুদ্ধির (Enlightenment) যে আন্দোলন শুরু হলো এই মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ- কোনো কোনো লেখকের ক্ষেত্রে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাস্তিকতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মকে জীবনের মৌলিক কর্মকান্ড থেকে বাদ দিয়ে দেয়া। এই আন্দোলনের কারণে বাস্তবে যেটা ঘটে গেল সেটা হলো

www.pathagar.com

সেক্যুলারিজম প্রাধান্য পেল এবং সমাজ সেক্যুলারিস্ট হয়ে গেল। সেখানে মোরালিটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল এবং রিজনকে (যুক্তি) প্রাধান্য দেয়া হলো। এতে মনে করা হলো- যুক্তিই সবকিছু সমাধান করতে পারে। যদিও আমরা জানি, যুক্তিবাদে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এর দ্বারা সব সমাধান করা যায় না। যুক্তিবাদ সত্ত্বেও মানুষের ভেতর এত মতবিরোধ হয়ে থাকে এবং আজকে যেটা যুক্তিসংগত মনে হয় কালকে সেটা যুক্তিসংগত থাকে না। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটা সময় গেছে যখন রিজনকে প্রায় পূজা করা হতো। আল্লাহর স্থানে, গডের স্থানে রিজনকে নিয়ে আসা হলো। যেটা ভ্রান্ত ছিল। যেটা বিভ্রান্তি ছিল, ভুল ছিল।

এনলাইটনমেন্ট মুভমেন্টের কারণে (ক্যাপিটালিজমের ভিত্তি হওয়ার কারণে বা এর ফলাফল স্বরূপ) চলে আসল ম্যাটেরিয়ালিজম (Materialism)- ভোগবাদ, ব্যক্তিবাদ, স্বার্থপরতা এইসব। বেশি হাই কনজাম্পশান চলে আসল। অন্যদিকে এটা একটা সামাজিক ডারউইনিজম সৃষ্টি করল। আমরা ডারউইনিজম সম্পর্কে জানি। সেই ডারউইনিজম হচ্ছে, জীব জগতের যে ধারণা সেটা ডারউইন থেকে এসেছে বা ডারউইন যেটা উদ্ভাবন করেছেন (Natural selection and survival of the fittest)। এখন সোস্যাল ডারউইনিজম বিশ্বব্যাপী এই গুরুত্ব পেয়েছে যে, এখানেও হবে Survival of the fittest এবং Natural selection. ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে এই এনলাইটনমেন্ট মুভমেন্টের কারণে এবং ম্যাটেরিয়ালিজমের বিকাশের কারণে এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেল যে, অর্থনীতিতেও natural selection হবে এবং এখানে শুধু ফিটেস্টরাই সারভাইভ করবে। যোগ্যরাই বাঁচবে। যদি তাই হয় অর্থনীতিতে, তাহলে তার মানে হবে প্রকৃতপক্ষে কোনো দুর্বলের স্থান থাকবে না। দরিদ্রের স্থান থাকবে না। তাদের খুব সংকীর্ণ স্থান থাকবে, যদি থাকে। সোজা কথা, বিশ্ব অর্থনীতি বড়লোকের, যোগ্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম, ম্যাটেরিয়ালিজম এনলাইটনমেন্ট মুভমেন্টের কারণে, সোস্যাল ডারউইনিজমের কারণে এটা একটি ডকট্রিন হলো। দর্শনে ঢুকে গেল যে, অর্থনীতিতে শুধু যোগ্যরাই সারভাইভ করবে। তার মানে দরিদ্রের প্রতি খৃস্টান ইথিকসের কারণে যে মায়া-মহব্বত ছিল, তাদের প্রতি যে দায়িত্ববোধ ছিল, সেটা ফিলোসফিক্যালি উঠে গেল। এমন কি দর্শনের মাধ্যমে সেটা উঠে গেল। তারা তখন যুক্তি খাড়া করতে পারল না যে, যদি দরিদ্র মরে যায় কি করা যাবে? ফিটেস্টরাই তো সারভাইভ করবে। দরিদ্ররা মরে যাবে এবং সবলরাই থাকবে। এই ধরনের ফলাফল দেখা দিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের কারণে।

এছাড়া ক্যাপিটালিজমের থিওরীর পেছনে কতগুলো অগ্রহণযোগ্য ধারণা ছিল (Concepts), যেগুলো কিছুটা আমাদের জানা দরকার। যেগুলো প্রকৃতপক্ষে

www.pathagar.com

একেবারেই সঠিক গ্রহণযোগ্যও নয়। যেমন একটি হচ্ছে তারা বলেন যে, অর্থনীতির আইনগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল ল'জের মতো। যেমন যেভাবে পৃথিবী ঘুরছে বা সূর্য যেভাবে চলছে নিজস্ব নিয়মে অথবা বায়ুপ্রবাহ অথবা নদী বা সমুদ্রের গতি প্রভৃতি ফিজিক্যাল ল'জ যেমন পারফেক্ট তেমনি ইকোনমিক ল'জও সিমিলারলি পারফেক্ট। Economic laws are like physical laws. এরকমই একটা ধারণা নিয়ে আসা হলো। তারা এগুলো বিশ্বাস করত বা করে। এবং এটা একেবারে সত্য নয় যে, আমরা নিজেরা জানি আমরা যদি কোনো মার্কেটে যাই মার্কেটে ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকে। যেই পরিবর্তন আমাদের সোলার (Solar) সিস্টেমে হয় না বা আমাদের ফিজিক্যাল ল'জে হয় না। অথচ মার্কেট- সেটা স্টক মার্কেটই হোক কি বাজারদর হোক- সবকিছু ব্যাপক পরিবর্তনের সম্মুখীন। সুতরাং এ রকমই একটা ভুল ধারণার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপিটালিজম।

দ্বিতীয়ত, তারা বললো যে, মানুষের কাজের মোটিভেশন বা কাজ করার প্রেরণাটা কি ? তারা বলল, মানুষের কাজের মোটিভেশন হলো শুধু তার স্বার্থপরতা (Pecuniary Interest)। মানুষ মূলত স্বার্থপর এবং তার স্বার্থপরতা, স্বার্থ উদ্ধার করা এটাই হচ্ছে তার মোটিভেশন, প্রকৃত মোটিভেশন। এটাকেই তারা টেকনিক্যালি বলে Rational Economic Man মানুষ হচ্ছে Rational, যুক্তিবাদী। এ যুক্তির পরিচয়টা কি? যুক্তির পরিচয় হচ্ছে এই যে, সে স্বার্থের জন্যে কাজ করে। তবে এ কথা ঠিক যে, মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা রয়েছে এবং স্বার্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মানুষ কেবল স্বার্থের জন্যেই কাজ করে- এ কথা সত্য নয়। তাহলে দুনিয়ায় এত ত্যাগ (Sacrifice) মানুষ করতে পারত না। পরিবারের জন্যে, সমাজের জন্যে মানুষ এত ত্যাগ তাহলে করত না। এত চ্যারিটি তাহলে দুনিয়াতে থাকতো না।

তৃতীয়ত, তারা একটি মূল্যবোধহীন অর্থনীতির জন্ম দিল। তারা একটি ডকট্রিন খাড়া করল পজিটিভিজম (positivism)। পজিটিভিজম হলো অর্থনীতিতে কোনো মূল্যবোধ নেই। অর্থনীতিতে মূল্যবোধ আসলেই অর্থনীতি প্রভাবিত হয়ে যাবে। অর্থনীতি তার ন্যাচারাল কোর্স থেকে সরে পড়বে। এ কথাও তারা বলতে চাইলেন যে, তাহলে অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান থাকবে না। কিন্তু এরকম দৃষ্টিভঙ্গি যে, অর্থনীতির কার্যক্রমে কোনো মূল্যবোধ থাকবে না- এটা অত্যন্ত মারাত্মক। এটা আমরা নিজেরাও বুঝি। আর তাই যদি হয় তাহলে কোন যুক্তিতে আমরা দরিদ্রের জন্য কাজ করব? দারিদ্র্য কেন দূর করব? কেন আমরা নিরক্ষরতা দূর করব? কেন আমরা বঞ্চিত জনগণের জন্য কাজ করব? এগুলো তো মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত।

সুতরাং পজিটিভিজম ধারণা ক্যাপিটালিজমে প্রবেশ করল যে, অর্থনীতিতে কোনো মূল্যবোধ নেই। ক্যাপিটালিজমের অপর নাম মূল্যবোধহীন অর্থনীতি। এটা

www.pathagar.com

কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না অথচ এটাই চলছে ক্যাপিটালিজমের নামে। আবার বলা যায় পুরোপুরি চলছেও না। কারণ মানুষের মানবিকতা কখনো কখনো এসব বিষয় কার্যকর হতে দেয় না। কারণ এগুলো সব আন-ন্যাচারাল (অস্বাভাবিক) ধারণা। এ জন্যে হয়ত বা এগুলো থিওরিতে আছে তবে বাস্তবে তা পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব হয় না।

তারপর ক্যাপিটালিজমের পর্যায়ে যে জিনিসটি বলা যায় সেটা হলো তারা যে মার্কেট সিস্টেমকে গুরুত্ব দিচ্ছে- (সত্য কথা মার্কেট সিস্টেমে বিরাট গুরুত্ব রয়েছে) তারও অনেক সমস্যা রয়েছে। সেটা তারা স্বীকার করে না। ক্যাপিটালিজমের যে মার্কেট সিস্টেম- এর অনেক ভালো দিক আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। Allocation of resource- এ মার্কেট একটি ভালো কাজ করে, এটা আমি অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, ক্যাপিটালিজমে মার্কেট সিস্টেমটাকে যে রকম পুরোপুরি পারফেক্ট মনে করা হয় তা কিন্তু সত্য নয়। বাস্তবে মার্কেট সিস্টেমের মাধ্যমে পুরোপুরি রিসোর্স বা সম্পদের সঠিক বন্টন (Proper allocation) হয় না। ন্যায়বিচারমূলক বন্টন হয় না। তার প্রমাণ স্বরূপ আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে বাস্তবে মার্কেট সিস্টেমে বা ক্যাপিটালিজমে যেটা হয় যে, একটা দেশে জনগণের একটা অংশের হাতে কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্রয়ক্ষমতা নেই। আমাদের দেশে অর্ধেকেরও বেশী লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। তাদের কাছে ডলার বা পাউন্ড নেই। তারা কিনতে পারে না। তারা প্রয়োজনীয় জীবনসামগ্রী কিনতে পারে না বলে তাদের প্রয়োজনটা মার্কেটেই যায় না, যেতেও পারে না। কারণ তাদের টাকা নেই, তারা কিনতে পারছে না। ফলে তাদের প্রয়োজন মার্কেটে আসছে না। তাদের দুধ দরকার সেই প্রয়োজন মার্কেটে আসছে না। তাদের ওষুধ দরকার সেই প্রয়োজন মার্কেটে যায়নি। তাদের বাড়ি দরকার, বাড়ি ভাড়া করা দরকার সেই প্রয়োজন মার্কেটে যায় না। কারণ তারা সেটা কিনতে পারছে না। এটা একটা দিক।

অন্যদিকে মার্কেট সিস্টেমে যেটা হয়, যাদের টাকা আছে তারা হয়ত চারটা গাড়ি কিনতে পারে। তারা বিরাট বিরাট বাড়ি বানাতে পারে। অন্যদিকে যাদের টাকা নেই তারা দুধ পর্যন্ত কিনতে পারে না। ওষুধ কিনতে পারে না। ফলে দুটো ফল জনগণের হয়। পূর্ণ ও সঠিক ডিমান্ডটা মার্কেটে আসতে পারে না বর্তমান মার্কেট সিস্টেমের কারণে এবং দ্বিতীয়ত প্রাইঅরিটিস (Priorities) নষ্ট হয়ে যায়। দরকার দুধের অথচ মার্কেট বলছে বিলাসসামগ্রী বানাও, কেননা Price mechanism-এর মাধ্যমে বাজারে ঐসব দ্রব্যের চাহিদা এসেছে। গাড়ির চাহিদাটাই মার্কেটে আসছে। দুধের চাহিদা আর আসতে পারছে না।

www.pathagar.com

সুতরাং মার্কেট সিস্টেম একটা পারফেক্ট সিস্টেম নয় যার মাধ্যমে Equitable allocation of resource হবে। কারণ রিসোর্স চলে যাবে সেই দিকে, যেদিক থেকে মার্কেটে ডিমান্ড আসছে। সম্পদ সেই দিকেই যাবে, যেই ডিমান্ডটি মার্কেটে আসে। ফলে যে ডিমান্ড আসছে না (দুধের ডিমান্ড পুরোপুরি আসছে না) সেদিকে তো সম্পদ যাচ্ছে না। এরকম প্রচণ্ড ইমপারফেকশন (Imperfection) মার্কেট সিস্টেমে রয়েছে। সুতরাং যারা মনে করেন মার্কেট সব সমস্যার সমাধান করবে (Market is everything and Market can solve all problems and market is perfect) তারা সম্পূর্ণ ভুল করেন, তারা মার্কেটের দাস (Servant) হয়ে যান। সেটা হওয়া ঠিক হবে না। Market is important, কিন্তু মার্কেট একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।

এই কনটেক্সটে (Context) এখন ইসলামের অর্থনীতির যে মূল ভিত্তি বা তার যে স্ট্র্যাটেজি-সে সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। তার কারণ হচ্ছে, এই যে ক্যাপিটালিজম, যেটা রুলিং আইডিওলজি, তার দুর্বলতা বোঝার কারণে আমরা ইসলামি অর্থনীতির কর্মকৌশলটা ভালো বুঝব। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ তিনটি বিষয় বা কনসেপ্টকে মূল ভিত্তি বলেছেন। একটি হলো তৌহিদ। এই তৌহিদ মানে হচ্ছে এই পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এটা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি নয়। সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মানুষের গুরুত্ব রয়েছে এবং সকল মানুষেরই গুরুত্ব দিতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে খেলাফত। খেলাফত হলো- মানুষ আল্লাহর খলীফা। প্রতিটি মানুষই- নারী পুরুষ নির্বিশেষে। আমেরিকান, ইউরোপিয়ান, এশিয়ান সকলেই আল্লাহর খলীফা। সূরা বাকারা, সূরাতুল ফাতিরে এবং অন্যান্য সূরাতে এ কথা বলা হয়েছে। খেলাফত অত্যন্ত সম্মানিত করেছে মানুষকে। মানুষ কোনো চান্স প্রোডাক্ট (Chance product) নয়। হঠাৎ করে একটা এক্সিডেন্টের মাধ্যমে সে সৃষ্টি হয়ে গেছে- এ রকম সে কিছু নয়। মানুষ জন্মগত অপরাধী (Born sinner)-ও নয়। যেমন পাশ্চাত্যে মনে করা হয়। খেলাফতের ধারণা মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। খেলাফতের তাৎপর্য হলো, Universal brotherhood. অর্থাৎ সকল মানুষ ভাই বা ভাই-বোন এবং ভাই-বোন হিসেবে তারা মর্যাদার অধিকারী, সমতার অধিকারী, এবং সমভাবে তাদের দিকে খেয়াল করতে হবে। খেয়াল করার প্রয়োজন রয়েছে। এর আরেকটা তাৎপর্য হলো, মানুষ মূল মালিক নয়। মূল মালিক আল্লহ পাক এবং সম্পদ (Resource) একটা আমানত মাত্র। যে কোনোভাবে সে সম্পদকে ব্যবহার করতে পারে না। সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে চেয়েছেন ঠিক সেভাবে, এগুলো হলো খেলাফতের ধারণার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য।

www.pathagar.com

তৃতীয় ভিত্তি জাস্টিস- ইনসাফ বা ন্যায়বিচার। আদল হলো কুরআনের পরিভাষা। কুরআনে প্রায় একশ' আয়াত আছে, যেখানে জাস্টিসের কথা বলা হয়েছে আরো একশ' আয়াত আছে যেখানে জুলুমের নিন্দা করা হয়েছে। তার মানে হলো, অর্থনীতিতে জুলুম থাকলে চলবে না এবং জাস্টিস আনতে হবে। এটাই হলো জাস্টিসের মূল তাৎপর্য।

কিন্তু প্রাকটিক্যালি আরো পরিষ্কারভাবে যদি বলতে হয় সেটা হচ্ছে যে, জাস্টিসের দাবী হলো সকল মানুষের প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে হবে, সকলের জন্য সম্মানজনক আয়ের (Respectable earning) ব্যবস্থা করতে হবে। এমনভাবে অর্থনীতিটাকে সাজাতে হবে, এমনভাবে কর্মকৌশলটাকে নির্ধারণ করতে হবে যাতে সকলের আয়ের ব্যবস্থা হয়। যদি কারোর আয়ের ব্যবস্থা না হয়, যদি কেউ সম্মানজনক আয়ের ব্যবস্থা না করতে পারে- (যদি তার কোনোরকম শারীরিক বা মানসিক দুর্বলতা থাকে বা অর্থনৈতিক কোনো বিপর্যস্ত অবস্থা থাকে সে অবস্থায় অনেকে হয়ত ইনকাম করতে পারল না) তাদের ব্যবস্থা করতে হবে তার পরিবারের বা আত্মীয়-স্বজনদের, তারা যদি না পারে তাহলে রাষ্ট্রকে করতে হবে। এই হলো মোটামুটি জাস্টিসের দাবী।

এখন আসা যাক ইসলামী অর্থনীতিতে যে কর্মকৌশল (Strategy) সে সম্পর্কে। চারটি স্ট্র্যাটেজির কথা আমাদের অর্থনীতিবিদরা বলেছেন। অনেক কথাই অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, তবে এর মধ্যে চারটি কথাই প্রধান বলেছেন। এর মধ্যে একটা হলো নৈতিক ছাঁকনি লাগবে। অর্থাৎ রিসোর্সের একটা পয়েন্ট অব টাইম বা সময়ের একটা সীমা আছে এবং এর ডিমান্ডটা প্রায় সীমাহীন। ফলে এ দু'টির মধ্যে মিলাতে গেলে ডিমান্ডের উপর এমন একটা ছাঁকনি দরকার যাতে ডিমান্ডগুলো যেন একটু কমে আসে, সংযত থাকে।

একটি ছাঁকনি হলো প্রাইস (Price) যেটা আধুনিক ক্যাপিটালিজমে আছে। প্রাইসের মাধ্যমে ডিমান্ডকে সংযত করা। আমার টাকা কম সুতরাং আমি কিনতে পারবো না- এটা হচ্ছে এক ধরনের ছাঁকনি, এক ধরনের ফিল্টার, যার মাধ্যমে এটা হয়। ইসলাম এই প্রাইস ফিল্টারকে মেনে নিয়েছে। আবার মেনে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস সে নিয়ে আসে। সেটাকে বলা হয় নৈতিক ফিল্টার। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ইসলাম এমন একটা নৈতিকতা সৃষ্টি করেছে- এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে যে, মানুষ যেন অপব্যয় না করে। অতিভোগ যেন না করে। অতিরিক্ত ভোগের দিকে যেন তার নজর না যায়। নৈতিক ছাঁকনির গুরুত্ব অনেক, কেননা মূল্য ছাঁকনি (price filter) দ্বারা কেবল দরিদ্র মানুষের দাবী কমানো যায়। সুতরাং এই একটা স্ট্র্যাটেজি ইসলামী অর্থনীতিবিদরা সাজেস্ট করেছেন (In addition to

www.pathagar.com

price filter), কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে একটা Moral filter নিয়ে আসা। নৈতিক ছাঁকনি নিয়ে আসা যাতে করে ডিমান্ড সংযত হয়ে যায়। প্রাইসের মাধ্যমেও আমরা ডিমান্ডকে সংযত করব, অন্যদিকে আমরা নৈতিক ছাঁকনির মাধ্যমে অতিরিক্ত ভোগ নিয়ন্ত্রণ করব। যতবেশি ভোগ করব, ততবেশি আল্লাহর কাছে দায়ী হব। আমাদেরকে জবাব দিতে হবে। এর জন্য চ্যারিটি করতে হবে। এইসব মাধ্যমে ডিমান্ডকে এর দাবীকে কমিয়ে এনেছে। যাতে নাকি আমাদের কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে রিসোর্সের প্রাপ্যতার সঙ্গে ডিমান্ডের সংঘাতটা কমে আসে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী অর্থনীতিবিদরা যে স্ট্র্যাটেজির কথা বলছে, সেটা হলো প্রপার মোটিভেশন (Proper motivation)। আমাদের প্রপার মোটিভেশন থাকতে হবে, প্রপার মোটিভেশন সৃষ্টি করতে হবে। ক্যাপিটালিজম এই মোটিভেশনকে একমাত্র স্বার্থ বলেছে। কিন্তু ইসলাম বলেছে, না। স্বার্থ ঠিকই আছে, সেটা অস্বীকার করছে না। কিন্তু এই স্বার্থ ধরতে হবে- (ক্যাপিটালিজমে যেমন শুধু দুনিয়াভিত্তিক স্বার্থ) ইসলাম বলছে এই স্বার্থপরতাকে বিস্তার করে দিতে হবে। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত মিলে যে স্বার্থ সে স্বার্থ। এ দুটো মিলে যাতে লাভ সেটাই তোমার স্বার্থ। এডুকেশনের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে, প্রচারের মাধ্যমে, ওয়াজের মাধ্যমে, দাওয়ার মাধ্যমে- সর্ব উপায়ে এটা করতে হবে। জনগণের মাঝে Proper motivation সৃষ্টি করতে হবে। অর্থনৈতিক কাজকর্মে কেবল দুনিয়ার স্বার্থ দেখলে চলবে না। দুনিয়ার স্বার্থ এবং আখেরাতের স্বার্থ দেখতে হবে। সুতরাং ইসলাম কি করেছে - মটিভেশনের যে স্বার্থপরতা, সেটাকে সে বিস্তৃত করে দিয়েছে। এখানে দুনিয়া ও আখিরাত মিলে যে স্বার্থ সেটাই হলো আসল স্বার্থ । বেসিক কর্মকৌশলের মধ্যে এটা রয়েছে।

উপরের বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সময় লাগবে। এ জন্য ইসলামী অর্থনীতিবিদরা তৃতীয় কর্মকৌশলও নির্ধারণ করেছেন Socio-economic financial restructuring. এই বিষয়টিকেই তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। অর্থাৎ সামাজিক ব্যবস্থাকে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এবং ফাইনান্সিয়াল ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হবে। এইসব বিষয় ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন, এর জন্য ইসলামী অর্থনীতিবিদদের বই পত্র পড়তে হবে। এটা আমার অনুরোধও। বিশেষ করে ড. ওমর চাপরার Islam and the Economic challenge বইটি পড়তে হবে। সেখানে তিনি অনেক সাজেশন দিয়েছেন। ব্যাংকিং সিস্টেমের কি পরিবর্তন করতে হবে, মনিটরিং পলিসির (Monitoring policy) কি পরিবর্তন করতে হবে। ফিসকেল (Fiscal) সিস্টেমে কি কি পরিবর্তন করতে হবে। ব্যাংকের টাকা সৃষ্টির ক্ষমতাকে (Power to money creation) কিভাবে সংযত করতে হবে। ফুল এমপ্লয়মেন্টকে নিশ্চিত করার জন্য কিভাবে স্মল ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতি গুরুত্ব দিতে

www.pathagar.com

হবে, মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এগ্রিকালচার এবং রুরাল অর্থনীতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শুধুমাত্র আরবান বেসড (Urban based) হলে চলবে না। বিস্তৃত আলোচনা ইসলামী অর্থনীতিবিদরা এ সম্পর্কে করেছেন। সেগুলো আমাদের দেখতে হবে এবং ইসলামের সিনিয়র ইকনমিস্টদের এ সম্পর্কিত বইপত্রগুলো পড়তে হবে।

কর্মকৌশলের চতুর্থ দিক হলো, তারা যে কথাটি বলেছেন তা হলো, Social re- structuring, Economic re-structuring এবং financial re-structuring- এই কাজটি করতে হবে সরকারকে। ইসলামের অবস্থা সমাজতন্ত্রের মত নয় যে, সরকারই সব করবে। আবার পুঁজিবাদের মতোও নয় যে, মার্কেটই সব করবে। ইসলাম বলে, মার্কেট আশি পার্সেন্ট করবে কিন্তু বিশ পার্সেন্ট সরকারকে করতে হবে (এ হার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে পারে)। এটাই হচ্ছে, Work of the state বা সরকারের ভূমিকা। এগুলোই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির মূল স্ট্র্যাটেজি- যে চারটির কথা আমি এতক্ষণ উল্লেখ করলাম। কিন্তু এখানে আবার উল্লেখ করছি যে, বিস্তৃত জানার জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই পড়তে হবে।

গ্রন্থসূত্র

১.কুরআনুল করীম
২.বুখারী ও মুসলিম শরীফ
৩. ড. ওমর চাপরা- ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, BIIT
৪. শাহ আবদুল হান্নান- ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা
৫. Duraut- The story of civilization
৬.Arnold Toynbee- A Study of History
৭. Paul A Samuelson- Economics
৮. ইমাম ইবন তাইমিয়া-আল হিসবাহ ফিল ইসলাম
৯.ইমাম শাতিবি- আল মুয়াফাকাত ফিল উসূল আল শরীয়াহ

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতি : প্রয়োগ ও বাস্তবতা

ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয়, এটা কোনো নতুন অর্থনীতি নয়। এর মূল ভিত্তি রয়েছে কুরআনুল করীমে- যা চৌদ্দশত বছর আগে নাযিল হয়েছিল। এর অপর মূল ভিত্তি রয়েছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষায়। আর এর প্রয়োগও শুরু হয় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ই।

রাসূল (স) মদীনায় গিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করেন। সেখানে বিভিন্ন জাতির লোকেরা ছিল। বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) নবী ছিলেন- একই সাথে তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন। সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো। তাঁর আমলে তাঁরই নির্দেশনায় সে দেশের অর্থনীতিসহ সবকিছু পরিচালিত হচ্ছিল। তখন থেকেই স্বাভাবিকভাবে মদীনা রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ শুরু হলো।

তিনি যে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পেয়েছিলেন তাতে দেখলেন তার মধ্যে কিছু ব্যবসা জুলুমমূলক। সেগুলো সুবিচারমূলক নয়। সেগুলোকে তিনি বাতিল করে দিলেন (যেমন : *মুলামাসা* এবং *মুনাবাদা* : দ্রষ্টব্য, বুখারী, কিতাবুল বাই)। তেমনি কৃষির ক্ষেত্রেও কিছু ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ থাকায় তিনি তাও বাতিল করে দেন। তিনি অনেক উৎপাদনকে বাতিল করে দেন। যেমন সে দেশে মদ উৎপাদন করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি কিছু পেশাকেও অবৈধ ঘোষণা করলেন। জুয়া খেলা সেখানে যেমন সম্ভব ছিল না তেমনি অশ্লীল কোনো দ্রব্য উৎপাদনও সম্ভব ছিল না। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগেই শুরু হলো।

রাসূল (স)-এর জীবনের শেষ দিকে এসে সুদ সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হয়ে যায়। তখন সুদমুক্ত একটি অর্থনীতি এসে যায়- যার মূল ভিত্তি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। তখন থেকেই ব্যক্তিমালিকানা কিংবা শরীকানায় ব্যবসা হতো। শরীক মালিকানায় লাভ-লোকসানকে ভাগ করে নেয়া হতো। কিংবা একজনের মূলধন হলে অন্যজনের শ্রম হতো- যাকে মুদারাবা (Mudaraba) বলা হয়। সেই ব্যবস্থাতেও লাভ বা লোকসান ভাগ করে নেয়া হতো। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই উমাইয়া (এর সময় প্রায় একশ' বছর) এবং আব্বাসীয় (প্রায় সাত আটশ' বছর)-এই সম্পূর্ণ যুগে ইসলামী অর্থনীতি চালু ছিল। এখানে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না- উমাইয়াদের শাসন ব্যাপক এলাকায় ছিল। উত্তর আফ্রিকাসহ ভারতের একটা অংশ তাদের অধীনে ছিল। মধ্য এশিয়া ও গোটা মধ্যপ্রাচ্যও তাদের অধীনে ছিল। পরবর্তীতে আব্বাসীয়দের আমলে এটা আরো বিস্তার লাভ করে। কাজেই সেটা

www.pathagar.com

ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বড় শক্তি (Greatest super power)। তারা ছিল তখনকার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রশক্তি, আন্তর্জাতিক শক্তি এবং সামরিক শক্তি।

আমরা জানি, সেই সময়ে অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছিল। শিল্পের, ব্যবসার, যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছিল। শিক্ষা, সাহিত্যের উন্নয়ন হয়েছিল। স্থাপত্যের উন্নয়ন হয়েছিল। সুতরাং বলা যায়, তারা একটি উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। তাদের সে রাষ্ট্রেরও আইনগত ভিত্তি ছিল ইসলামী শরীয়ত। সেই রাষ্ট্রের বৈধতার (Legitimacy) ভিত্তি ছিল ইসলাম বা আল কুরআনুল করীম। কাজেই সেই রাষ্ট্র ইসলামী অর্থনীতিকে ফলো করছিল।

এখন ইসলামী অর্থনীতি বলতে কি বোঝায়? সেই যুগে যে প্রযুক্তি (Technology) ছিল সেটাই কি ইসলামী অর্থনীতি? নাকি অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের যে শিক্ষা, ইসলামের যে লক্ষ্য এবং ইসলামের যে মূল্যবোধ সেগুলোকেই কার্যকর করা হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি? আবার ইসলামী অর্থনীতির প্রশ্নে বলা যায়- কি অর্থে সেখানে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ করা হয়েছিল। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, টেকনোলজিই ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা নয়। কারণ টেকনোলজি যুগে যুগে পরিবর্তন হয়ে যায়। তেমনিভাবে যে ব্যবসায় সংগঠন (Business organization)-সেটাও মূল কথা নয়। আজকের দিনে আমরা করপোরেশন (Corporation) দেখছি, যেটা আগের দিনে ছিল না। এই করপোরেশন সিস্টেম মাত্র একশ'-দুইশ' বছর আগে এসেছে। অর্থাৎ বোঝা যায় যে, ব্যবসা সংগঠনের শেপ (Shape) কি বা কি পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসাকে বা প্রতিষ্ঠানটিকে সংগঠিত করা হয়েছে- সেটা মূল জিনিস নয়। মূল জিনিস হলো কোন জিনিসে ব্যবসা করা বৈধ আর কোন জিনিসে ব্যবসা করা বৈধ নয়। কোন পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ আর কোন পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ নয়।

কাজেই আমরা যখন ইসলামী অর্থনীতির কথা বা এর প্রয়োগের কথা বলছি তখন আমরা বোঝাচ্ছি তার নীতিগুলোকে, তার মূল্যবোধ, তার লক্ষ্য কি। সে কি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন চাচ্ছে- এই ভিত্তিতে আমরা এই বিষয়টিকে দেখছি।

আজকের দিনে যে ইসলামী অর্থনীতি হবে, সেখানে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা হবে। নতুন যে বিজনেস অর্গানাইজেশন, যেমন আগে উল্লেখিত করপোরেশন অথবা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ (Joint stock companies)- এগুলো সেখানে থাকবে। এখানে শেয়ার (share) ব্যবস্থা থাকবে। আগের দিনে শেয়ারের ধারণা ছিল না। বাস্তবে বিভিন্ন মালিকানা থাকলেও তখন শেয়ার সার্টিফিকেট ছিল না, শেয়ারের ভিত্তিতে মালিকানা ভাগ করা হতো না, এগুলো সবই গ্রহণ করা হবে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আমরা জানি ওআইসি'র (OIC) ফিকাহ একাডেমী এগুলোকে বৈধ ঘোষণা করেছে। শ্রেষ্ঠ আলিম দ্বারা সকল যুগেই এ সব অর্গানাইজেশন, নতুন টেকনোলজি বা শেয়ার সার্টিফিকেট (যদি তা বৈধ ব্যবসার হয়)- তাকে তারা বৈধ ঘোষণা করেছেন।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে এখন যদি আমরা এর ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য করি- যেমন এখানে এতক্ষণ যা আলোচনা করা হলো- তাহলে আমরা দেখতে পাব ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর হয়েছিল। আর এটা এই জন্যেই সম্ভব হয়েছিল যে, ইসলামের যে যাকাত ব্যবস্থা এবং ইসলামের ওয়াকফ'র যে ব্যবস্থা তার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা সহজ। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি প্রধানত সরকারী ছিল না। এটা এক দল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা সংগঠিত ছিল। ইসলামী অর্থনীতি যেহেতু অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশে বিশ্বাস করে, মানুষের যে উদ্ভাবনী শক্তি তার উপর বিশ্বাস করে, মানুষের যে যোগ্যতা (Capacity) তার উপর বিশ্বাস করে এবং যেহেতু ইসলাম মানুষকে প্রয়োজনীয় কিছু বিধি-নিষেধের আওতায় স্বাধীনতা দেয়, ফলে সে অর্থনীতি সাধারণত বিকাশমান হয়। অগ্রগতিমুখী হয়। সে কারণেই অর্থনীতি তখন উন্নতি করেছিল। আর অর্থনীতি উন্নত করার কারণে দারিদ্র্য কম ছিল।

একইভাবে তখন ইসলামী অর্থনীতির জন্যে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটে। ইন্ডাস্ট্রিজ ফ্লারিশ (Flourish) করেছিল। তখন দারিদ্র্য খুব কমই দেখা দেয় এবং যাও দেখা দিয়েছিল তা প্রাকৃতিক কারণে, দুর্ভিক্ষ (Famine) দেখা দেয়ায়। দেখা গেলো কোনোখানে বৃষ্টিপাত হয়নি। আর এসব কারণে যেখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা সাধারণত সরকার তার রাজস্ব ব্যবহার করে, তার বায়তুল মালের অর্থ দ্বারা সেটাকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে এবং তা করেছে। আর এ ধরনের পরিস্থিতির কথা যদি আমরা বাদ দেই তাহলে সাধারণভাবে যে পরিস্থিতি ছিল তাতে যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তখন খুব কম লোকই গরীব ছিল। কিন্তু যারা ধনী তাদের (অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে) প্রচুর অর্থবিত্ত ছিল। তাদের যাকাত হতো। মুসলিম ইতিহাসে এমন অনেক সময় গেছে যখন যাকাত দেয়ার মতো তারা লোক পেতেন না।

এরপর ওয়াকফ'র কথা যদি বলি তাহলে বলব ইসলামে দানকে, *ইনফাক ফি সাবীলিল্লাহ*- আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ফলে সকলেই চাইতেন কিছু সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে ওয়াকফ করে দিতে। এই ওয়াকফ'র আয় থেকে শুধুমাত্র ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলত বা আমরা যাকে সরাইখানা বলি (অর্থাৎ তখনকার পথিক বা আগন্তুকদের জন্য যে মেহমানখানা) তা চলত- যা সরকার চালাতেন। তখন প্রায় সবখানেই সরাইখানা ফরা হতো । এইসব

www.pathagar.com

ওয়াকফ'র আয় দ্বারা ছাত্রদের বেতন দেয়া হতো। দরিদ্রদের সাহায্য করা হতো। তাদের বৃত্তি দেয়া হতো। এমনিভাবে সার্বিক অভাব মুসলিম বিশ্ব থেকে দূর করা সম্ভব হয়েছিল। তখন মুসলিম বিশ্বের কোনো ব্যক্তি অভাবী ছিলেন বা দরিদ্র ছিলেন বা না খেয়ে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে- এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। কিংবা বলা যায় ঘটেনি, বিশেষ করে উমাইয়াদের আমল থেকে শুরু করে কলোনিয়াল (Colonial) ব্যবস্থার উত্থানের আগ পর্যন্ত।

ইসলামে যাকাত এমন একটি ব্যবস্থা যা কঠিন দারিদ্র্য (Hard core poverty) দূর করতে সক্ষম। এর মূল কারণ হলো বর্তমানে আমাদের কিংবা বিভিন্ন দেশে যে এনজিওগুলো (NGO) তারা যে স্বল্প ঋণ দেয় (যদি টাকার হিসেবে বলি, পাঁচ হাজার বা দশ হাজার এরকম) আর তা তাদেরকে এক বছর, ছয় মাস, তিন মাস, এমনি করে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ফেরত দিতে হয়। এ সমস্ত স্বল্প আয় থেকে ঋণ ফেরত দেয়া এবং তার উপর আবার বাড়তি সুদ ফেরত দেয়া- যেটা এনজিওরা চায় তা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় না। এ জন্যে এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচন করতে বিশেষ করে Hard core poverty দূর করতে পারে না।

কিন্তু ইসলামে যে যাকাত ব্যবস্থা, সেটা হলো প্রকৃতপক্ষে ট্রান্সফার (Transfer), এটা একবারে দিয়ে দেয়া হয়; এটা আর ফেরৎ নিতে হয় না। এ প্রসঙ্গে আমাদের স্কলাররা বলেছেন, যাকাত এমন পরিমাণ দিতে হবে যাতে যাকাতগ্রহীতা স্বাবলম্বী হয়ে যায়। অধিকাংশ ফিকাহবিদ এ কথাই বলেছেন যে, এমনভাবে দিতে হবে যাতে তাকে আর কারো কাছে যেতে না হয়। অর্থাৎ স্বাবলম্বী করে দাও, কিংবা অন্তত এই পরিমাণ দাও যাতে এক বছর আর তার কাছে ফিরে আসতে না হয়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি তার বাস্তব প্রয়োগের কারণেই তখন কঠিন দারিদ্র্য (Hard core poverty) দূর করা সম্ভব হয়েছিল। এখনও যদি মুসলিম বিশ্ব দারিদ্র্য দূর করতে চায় তাহলে যাকাতকে এবং যাকাতের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের ট্রান্সফারের মাধ্যমেই এই কাজটি করতে হবে।

এক্ষেত্রে এনজিওদের প্রতি আমার পরামর্শ হবে- এনজিওরা যেভাবে করছে তার মাধ্যমে হবে না। তাদের মধ্যে ট্রান্সফারের একটা উপাদান (Element) থাকতে হবে। ইসলামের দাবী এটা যে, তারা সুদভিত্তিক কোনোকিছু না করুক। তারা সেটাকে মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ করে ইসলাম ভিত্তিতে করুক। এটা তারা সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে করতে পারে। তাতে তাদের লাভ হবে না কিন্তু তাদের খরচ উঠে আসবে। এখানে সার্ভিস চার্জ হলো, যে পরিমাণ দিয়েছি তার উপর এত পরিমাণ নেয়া যাতে তার প্রশাসনিক খরচ (Administrative cost) আদায় হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে এক পয়সাও বেশি নিলে তা সুদ বলে গণ্য হবে। এটাই হলো ওআইসি'র ফিকাহ একাডেমীর ফতোয়া বা ঘোষণা বা রুলিং।

www.pathagar.com

এনজিওগুলোর উচিত হবে সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে করা- সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর যেটা করতে হবে সেটা হলো এই ধরনের ঋণের সাথে ট্রান্সফারকে একত্র করা। কথা উঠতে পারে, যদি দান বা অনুদান দেই তাহলে সেটা তারা খেয়ে ফেলতে পারে। তারা সেটা ফেরত দেবেও না বরং খেয়ে ফেলবে, তাতে কাজ হবে না। এই সমস্যাগুলো রয়েছে। আর এটা যে হতেও পারে তা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের মধ্যে স্বভাব খারাপের জন্যে এরকম পরিস্থিতি হতে পারে। কিন্তু তথাপি আমাদের ভালো সুপারভিশনের মাধ্যমে এই পদ্ধতি সার্থক করার চেষ্টা করতে হবে, অন্য পদ্ধতিতে হবে না।

যাকাতের ব্যাপারে আইন কি হবে তার একটা স্ট্রাকচার আমরা ইতোমধ্যে পাকিস্তানে পেয়ে গেছি। সেদিক থেকে যাকাতের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। যদিও সরকারী পর্যায়ে আদায়ের ব্যাপারটি এখনো ভালো করে গড়ে ওঠেনি। আদায় এবং বন্টনের ক্ষেত্রে সেটাকেই এখন গড়ে তুলতে হবে। এটা সামাজিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমেও হতে পারে। রাষ্ট্র যদি বলে দেয় আমরা এই অংশটুকু পর্যন্ত আদায় করব, বাকীটা জনগণ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে আদায় করবে। সেটাও সম্ভব, একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। যদিও সেটার অনেক আইনগত বা শরীয়ত সংক্রান্ত দিক রয়েছে। সেগুলো পরীক্ষা করে আমাদেরকে দেখতে হবে। যদিও এটা বড় কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না (যাকাত সম্পর্কে দ্রষ্টব্য : ইসলামে যাকাতের বিধান : ড. ইউসুফ আল কারদাভী)। আগে এক সময় ছিল যাকাত মানুষ একদম দিত না। এখন যারা ব্যবসায়ী, যারা শিল্পপতি তারা যাকাতের জ্ঞান উপলব্ধি (Awareness) বা প্রকৃতি (Nature) সম্পর্কে বুঝে গেছে। ফলে ভালো লক্ষণ হলো যারা এটা জানে তাদের অধিকাংশই এখন যাকাত দেন। তারা যতটুকু বোঝেন ততটুকুই দেন। এ ক্ষেত্রে তাদের উপলব্ধি আরো ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। আলিমদের দায়িত্বও অনেক। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, আলিমরা অনেক পুরোনো বই পড়েছেন কিন্তু তাঁদের আধুনিক বইও পড়া প্রয়োজন।

ইসলামে যাকাতের বিধান আল্লামা ইউসুফ আল কারদাভীর এই বইটি পড়লে দেখা যায় যে, যাকাত কতবড় মাধ্যম এবং এর মাধ্যমে বিশ্বের কত সমস্যার সমাধান করা যায়। অর্থনীতির কত সমস্যার সমাধান করা যায়।

হাজার বছর মুসলিম শাসনের পর মুসলিম শাসনের পতন হলো। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়লাম। তারই ফলে আমরা সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়লাম। জ্ঞানের সাথে সাথে সামরিক ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়লাম। কারণ মিলিটারী হার্ডওয়ার বা এর যে সুপিরিয়রিটি- তার পেছনে রয়েছে নলেজ। আবার টেকনোলজী তারও পেছনে রয়েছে নলেজ। এই জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণে আমরা

www.pathagar.com

সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়লাম। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো (Colonial power) জোর করে আমাদের দেশ দখল করার সুযোগ পেয়ে গেল। আর তারা আমাদের দেশে এসে দুনিয়ার যত অবৈধ ব্যবসা সম্ভব তা শুরু করল। মদের ব্যবসা শুরু করল। আবার অন্যান্য সুদভিত্তিক কাজ কারবার চালু করল। পরবর্তীকালে সুদভিত্তিক ব্যাংক চালু করল। ফলে এই কলোনিয়াল প্রভাবের কারণে মুসলিম বিশ্ব ইসলামী অর্থনীতি থেকে অনেকটা দূরে সরে গেল। ব্যক্তিগত জীবনে তারা মুসলিম থাকল। যতটা সম্ভব ইসলামী কালচার থাকল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে অনৈসলামিক উপাদান বাড়তে লাগল।

এরপর আবার ইসলামের নব উত্থান ঘটে। The new rise of Islam– ইসলামের নতুন করে জাগরণ শুরু হলো। সেটা ঘটে গত একশ' বছর আগে। এরপর পঞ্চাশ ষাট বছর আগে বিভিন্ন দেশ স্বাধীন হতে থাকে। পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হলো। আস্তে আস্তে মুসলিম দেশগুলো স্বাধীন হলো। সবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীন যে সব মুসলিম দেশ ছিল তা স্বাধীন হয়ে গেল। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে বহু লোকই ইসলামের জন্য কাজ করতে লাগলেন। ইসলামী আন্দোলনের উত্থান হলো। তারা ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন এবং নতুন করে ইসলামী আইন (Legislation) লেখা শুরু হলো। পাকিস্তানে অনেক ধরনের আইন হলো- যাকাতের উপর, উশরের উপর। এমনকি তারা নতুন প্যানাল কোড করলেন। সাক্ষ্য আইন (Evidence Act) করলেন। অন্যান্য আইনে ইসলামী ধারা সংযোজন করলেন। ইসলামী কন্সটিটিউশন করলেন। এভাবে ইরান, সুদানে একই ব্যাপার হলো। আবার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াতে কিছু হলো। এভাবে সকল মুসলিম দেশে কিছু না কিছু ইসলামী আইন হতে লাগল। বাংলাদেশেও কিছু হলো। শাসনতন্ত্রে কিছু ইসলামী ধারা যোগ হলো। যাকাত অর্ডিন্যান্স হলো। এর ফলাফল স্বরূপ ইসলামী ব্যাংকিং শুরু হলো। অর্থনীতির সবচেয়ে বড় একটা উপাদান বা টুল হচ্ছে ব্যাংকিং। এই ব্যাংকিং-এর মাধ্যমেই অর্থের (Money) আদান-প্রদান হয় এবং এরই মাধ্যমে অর্থনীতি গড়ে ওঠে। আমরা যদি ইসলামী ব্যাংকিংকে এগিয়ে নিতে পারি, ইসলামী ব্যাংকিং যদি জাতীয় ব্যাংকিং সিস্টেম হয়ে যায় তাহলে সুদ অটোমেটিক উঠে যাবে। আবার সুদের উপর মানুষের এমনিতেই আস্থা নেই। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, মুসলিমরা সুদ চায় না, বাধ্য হয়েই সুদে জড়ায়।

ইসলামী ব্যাংকিং যদি সাকসেসফুল হয়, অনেক দেশে ইসলামী ব্যাংকিং মেজর ফ্যাক্টর হয় অথবা অধিকাংশ ব্যাংক ইসলামিক হয়ে যায় কিংবা রাষ্ট্র যদি এটাকে গ্রহণ করে, যেমন ইরানে করেছে, পাকিস্তানে হতে যাচ্ছে (কিছুটা একবার হয়েছে আবার সুপ্রীম কোর্ট বলেছে পুরোপুরি করতে হবে), মালয়েশিয়ায় ইসলামী

www.pathagar.com

ব্যাংকিং যে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে- এরকম যদি হয় তাহলে সুদ ক্রমে দূর হয়ে যাবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

নতুন যুগে এই ইসলামী ব্যাংকিং- এর যে প্রয়োগ শুরু হলো তা ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংক একটা বড় ভূমিকা পালন করছে। প্রায় সকল মুসলিম দেশেই এখন ইসলামী ব্যাংক হয়ে গেছে। প্রায় দুশো'র মতো ইসলামী ব্যাংক তাদের অনেক শাখা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। এই ব্যাংকগুলো আরো ব্যাপক হচ্ছে। এতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং সফল হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা করছে। এছাড়াও তারা ইসলামের যে সামাজিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যাবলী (Socio-economic objectives) তা কার্যকর করার জন্য চেষ্টা শুরু করেছে।

এসব লক্ষ্যের মধ্যে আছে মানুষের প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে হবে, সুবিচার করতে হবে এবং তা যদি করতে হয়, মানুষের চাহিদা পূর্ণ করতে হয় তাহলে অনেক কিছুই আমাদের করতে হবে। এর মধ্যে অন্যতম একটা হলো পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full employment)। অর্থনীতিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে মানুষের পূর্ণ কর্মসংস্থান হয়। কর্মসংস্থান হলে আয় হবে আর আয় হলে তাদের চাহিদা পূর্ণ হবে। আমরা যদি তাই কাজের বা নিয়োগের ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আয় হবে না- আর আয় না হলে চাহিদাও অপূর্ণ থেকে যাবে, প্রয়োজনও পূর্ণ হবে না। সমাজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে আর সেটা ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য নয়। ইসলামী অর্থনীতি চায়, যে সব লোক কোনোভাবেই কাজ জোগাড় করতে পারছে না (যেমন সে অসুস্থ বা অতি বৃদ্ধ বা বিধবা এরকম অন্যান্য অসুবিধা যাদের আছে) সে সব ব্যক্তিকে তার পরিবার প্রথমত চালাবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় আত্মীয়-স্বজন তারাও করবে। আর যদি তা না করতে পারে, তাহলে তা রাষ্ট্র করবে। এছাড়া ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে রোজগার করবে, ভালো রোজগার করবে। অর্থনীতিতে সফল হতে হবে। সে রোজগার করতে পারবে এবং সেই রোজগারের ভিতর তাকে চলতে হবে।

এসব করতে গেলে আজকের যুগে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে রুরাল ইকোনমি (Rural economy) গড়ে তুলতে হবে। কারণ জনগণের একটা বিরাট অংশ কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে আশিভাগ- গ্রামে বাস করে। কোথাও ষাট ভাগ আবার কোথাও ত্রিশ বা চল্লিশ ভাগ গ্রামে বাস করে। আরব দেশের কোথাও দশ বা বিশ ভাগ গ্রামে বাস করে। পাকিস্তানে ষাট বা পঁয়ষট্টি ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রে সত্তর ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। এসব কারণে আমাদের রুরাল অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হবে। আমাদেরকে গ্রামীণ অর্থনীতি; এগ্রিকালচারকে গড়ে তুলতে হবে। শুধু ইণ্ড্রাস্ট্রি করলে চলবে না। ইন্ডাস্ট্রি করতে

www.pathagar.com

হবে কিন্তু কৃষিকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে, যাতে গ্রামীণ জনগণের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা উন্নত হতে পারে।

তেমনিভাবে শহরাঞ্চলকে যদি সামনে রাখি তাহলে বড় ইন্ডাস্ট্রি তো করতেই হবে। সাথে ছোট ইন্ড্রাস্ট্রিও করতে হবে। কারণ ছোট ইন্ড্রাস্ট্রি করতে পারলেই বেশি কর্মসংস্থানকে নিশ্চিত করা যায়। সেই সাথে আত্মকর্মসংস্থানের (Self employment) সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এগুলো ব্যাপকভাবে করতে হবে। এসব কাজ বিভিন্ন এনজিও করতে পারে। সমাজ সাহায্য করতে পারে। আমরা একে-অপরকে সাহায্য করতে পারি। ব্যাংকিং সিস্টেমের একটি অংশ এ কাজে ব্যয় হতে পারে। সরকারও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

এভাবে আমরা ইসলামের সামাজিক লক্ষ্যগুলো- নীড ফুলফিলমেন্ট (Need fullfilment), জাস্টিস (Justice) যদি করতে পারি তাহলেই একটা সংঘাত মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে।

ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। আমাদের দেশেই শুধু নয়, প্রত্যেক মুসলিম দেশেই যারা সমাজ চালাচ্ছেন- তাদের মধ্যে ইসলামের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এগুলোকে দূর করতে হবে। মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা কারণে, নানা ভীতি রয়েছে- যেহেতু ইসলাম খুব কঠিনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সে ভীতিগুলো দূর করতে হবে। তাহলেই আমাদের যে এলিট শ্রেণী, উচ্চ শ্রেণী বা সবচেয়ে শিক্ষিত শ্রেণী, তারা ভয়মুক্ত হবে। তারা তখন ইসলামের প্রয়োগের ব্যাপারে আগ্রহী হবে।

তেমনিভাবে পাশ্চাত্য এ ব্যবস্থা চায় না- সে সমস্যাও রয়েছে। আবার তারা তাদেরটা বাদ দিয়ে আমাদেরটাই বা চাইবে কেন? সে ক্ষেত্রেও সমাধান কঠিন। কিন্তু আমরা যদি যোগ্য হয়ে উঠি- আমরা যদি আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, আমরা যদি সবাই শিক্ষিত হয়ে যাই, আমরা যদি আমাদের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে পারি; আমরা যদি আমাদের সম্পদকে (Resource) ব্যবহার করতে পারি তাহলে পাশ্চাত্যের কাছে আমরা তত দায়বদ্ধ থাকব না। আর আমরা যদি তাদের কাছে দায়বদ্ধ না থাকি তাহলে পাশ্চাত্যের সাথে সংঘাত না করেও আমরা আমাদের পদ্ধতি ফলো করতে পারবো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা স্বীকার করতেই হবে, মুসলিম দেশগুলোতে নানা রকম ডিক্টেটরশীপ (Dictatorship) রয়েছে, রাজতন্ত্র রয়েছে। এগুলো সহায়ক নয়। এগুলো ইসলামিকও নয়। আমাদেরকে আল্লাহর আইনের অধীনে জনগণের সরকার, যেটাকে আমরা শূরাভিত্তিক শাসন বলি বা যেটাকে আমরা গণতন্ত্র বলি সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

www.pathagar.com

হিউম্যান রাইটস্ (Human rights) প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জবাবদিহিতামূলক (Accountable) সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এসব কথাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেন। এগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। ডিক্টেটরের অধীনে কোনো কোনো সময় সাময়িকভাবে উন্নতি হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী (Long-term) ডিক্টেটরের অধীনে কল্যাণমুখী অর্থনীতি গড়ে ওঠে না।

আমরা সামনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখি, যদি ইসলামের সংকটগুলো, দারিদ্র্যের সংকট, শিক্ষার সংকট, পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে আমাদের যে সংঘাত- এই সংঘাতগুলোকে আমরা যদি কাটিয়ে উঠতে পারি, আমরা যদি আমাদের নিজেদের যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে, আমাদের মধ্যে যে অতি গোঁড়ামী রয়েছে, কোথাও কোথাও যার কোনো ইসলামী ভিত্তি নেই- সেগুলো যদি আমরা দূর করতে পারি; আমরা যদি একটা Balanced understanding of Islam অর্জন করতে পারি, আমরা যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ উপলব্ধি (ফিকহ) অর্জন করতে পারি- তাহলে আমি মনে করি, ইসলামী অর্থনীতি ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী হতে থাকবে।

এর জন্য ইসলামী জ্ঞানের ব্যাপক বিস্তার করা দরকার। ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তার করা দরকার। ইসলামের যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠা দরকার। ইসলামী আন্দোলনগুলোকে আরো যোগ্য হওয়া দরকার। এসব যদি করা সম্ভব হয় তাহলে মুসলিম বিশ্ব ক্রমাগতভাবে ইসলামী অর্থনীতির নিকটে চলে আসবে। তাহলে মুসলিম বিশ্ব থেকে সুদ উঠে যাবে। অবৈধ ব্যবসা উঠে যাবে, জালিয়াতি কমে যাবে। ভেজাল, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি কমে যাবে- যদিও রাস্তা যে দুর্গম তা অস্বীকার করা যায় না। এর জন্য অনেক পরিশ্রম দরকার, অনেক প্রচেষ্টা দরকার- সেগুলোকেও অস্বীকার করা যায় না।

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতি ও তার বাস্তবায়ন

বিশেষজ্ঞদের ব্যাপক গবেষণার ফলে *ইসলামী অর্থনীতি* বিষয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক বিষয়েরই বিকাশ হতে থাকে এবং ইসলামী অর্থনীতিও ভবিষ্যতে বিষয় হিসেবে ব্যাপক বিকাশ হবে বলে আশা করা যায়।

ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু (Scope) নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা আছে। সাধারণভাবে ইসলামী অর্থনীতি বলতেই 'যাকাত' ও 'সুদ' সংক্রান্ত আলোচনা, খুব বেশী হলে ইসলামী ব্যাংক সংক্রান্ত আলোচনাকে বোঝা হয়। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। অর্থনীতির তত্ত্বগত ও প্রয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই ইসলামী অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য নিরসন, নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও যথাযথ বন্টন। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলাম একটি ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক স্বাধীন অর্থনীতি কায়েম করতে চায় যাতে উৎপাদনের, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা থাকবে, যেখানে শ্রমিকের অধিকারের দিকে বিশেষ নজর দেয়া হবে, যেখানে বিনিয়োগ হবে প্রধানত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (মুদারাবা ও মুশারাকা), যেখানে অভাবগ্রস্তদের সমস্যা দূর করার জন্য যাকাত ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি, যথাযোগ্য বন্টন ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই ইসলাম তার অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করবে। এ প্রেক্ষিতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, *ইসলামী অর্থনীতি* বিষয়ে (Subject) উৎপাদন, বন্টন, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এসব এবং এগুলোর থিওরী অন্তর্ভুক্ত হবে। এসব থিওরী না বুঝে কেউ উৎপাদন, বন্টন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া ভালো করে সম্পন্ন করতে পারবে না। সুতরাং Micro ও Macro economics-এর সকল বিষয়ই *ইসলামী অর্থনীতির* অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তা পড়তে হবে। অবশ্য থিওরীর সকল ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতে হবে এবং তা ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ তাদের বইয়ে আলোচনাও করেছেন। অর্থনীতির অধিকাংশ থিওরীকে পুঁজিবাদের অংশ মনে করা একেবারে অসঙ্গত। এগুলো হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ধরনের তত্ত্ব, যেমন Theories of price, firm, trade- যা সকল চিন্তাধারাতেই ব্যবহার করা যায়। উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হলো যে, ইসলামী অর্থনীতির Scope বিশাল। ইসলামী বাজার ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কেও কিছু বিভ্রান্তি আছে। ইসলাম বাজার ব্যবস্থাকে স্বীকার করে এবং গুরুত্ব দেয়।

www.pathagar.com

বাজার (Market)-এর মাধ্যমে চাহিদা (Demand), ভোক্তার পছন্দ (Preference) বোঝা যায়। সে মোতাবেক উৎপাদনও যোগান দেয়া যায়। চাহিদাও যোগান দ্বারা মূল্য বা Price নির্ধারিত হয়ে থাকে। ইসলামের শুরুতে যে অর্থনীতি বিরাজ করছিল তাতে দেখা যায় যে উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, বিনিয়োগ ও মূল্য নির্ধারণ স্বাধীনভাবে হতো, যদিও তা ইসলামের হালাল ও হারামের নীতির অধীন ছিল। এটাকে স্বাধীন বাজার ব্যবস্থা বলতে হয়।

কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে বাজারের দাস (Servant) হতে বলেনি। বাস্তবক্ষেত্রে আমাদেরকে ইসলামের অন্যান্য নীতিমালাও অনুসরণ করতে হবে। যেমন বাজারের নামে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী না দেয়া চলবে না। শ্রমিককে বাঁচার মতো মজুরী দিতে হবে। পুরাতন পুঁজিবাদের সময়ে বাজারের নামে শ্রমিককে বঞ্চিত করা হতো, তাদের উপযুক্ত মজুরী দেয়া হতো না। যার ফলে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় আর নানা দেশে রক্তাক্ত বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং বিশ্বের অনেক দেশ প্রায় ৮০ বৎসর এক ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বে বাস করে। ইসলাম এ ধরনের নীতি সমর্থন করে না। ইসলাম আমাদেরকে আবদুল্লাহ (আল্লাহর দাস) হতে বলে, বাজারের দাস (আবদুল মার্কেট) হতে বলে না। বাজার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শ্রমিক ও বঞ্চিতদের অধিকার সমানভাবে বরং বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক ও কর্মচারীকে ন্যায্য মজুরী দিয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারে, কেবল সেগুলো Long-term টিকে থাকবে। যারা তা পারে না, তাদেরকে তাদের বিনিয়োগকে নতুন ক্ষেত্রে সরিয়ে নিতে হবে, যাতে তারা ন্যায্য মজুরী দিয়েও টিকে থাকতে পারে। ইসলামের সঠিক নীতিমালা এটাই।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশে ইসলামী প্রশাসন হলে কি দ্রুত অবস্থার উন্নতি হবে? এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন; এটা নির্ভর করবে ইসলামী প্রশাসনের যোগ্যতার উপর। যদি তারা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন তবে কর না বাড়িয়েও একই টাকা সদ্ব্যবহার করে অধিকতর কাজ করতে পারবেন। ইসলামী প্রশাসন হলে উচ্চপর্যায়ে দুর্নীতি দূর হবে যার ফল নীচের দিকেও যাবে। তারা যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে কয়েক বৎসরের মধ্যে acute poverty দূর করতে পারবেন বলে মনে করি। তবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সময় লাগবেই। রাজস্ব বাজেট বা উন্নয়ন বাজেটে বিভিন্ন খাতে যে ধরনের বরাদ্দ আছে (Inter-sectoral allocation) তাতে তেমন পরিবর্তনের অবকাশ নেই। আসলে প্রায় সব খাতেই আরো বরাদ্দ প্রয়োজন অথচ সে পরিমাণ অর্থ আমাদের হাতে নেই। কর ফাঁকি রোধ, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভব হলে কর রাজস্ব বৃদ্ধি, বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে উন্নয়ন দ্রুততর করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতি : কিছু দিক

মানব জীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক সমস্যাকেই সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপর ইসলামী দাওয়াতের অগ্রগতি নির্ভরশীল। কেননা দারিদ্র্য জর্জরিত জনগণ ইসলামের দাওয়াত বোঝার অবকাশই পায় না। এ জন্য ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিগুলো নির্ধারণ এবং সে আলোকে বিশদ বিধান (Laws and regulations) তৈরী করা বিশেষ জরুরী। নব্য স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশ যেন ইসলামের আলোকে হতে পারে, সে জন্য ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রশাসকদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে কিছু মনীষী ও সংস্থা গত দুই দশকে অনেক মূল্যবান কাজ করেছেন। সংস্থাসমূহের মধ্যে আমেরিকার Association of Muslim Social Scientists, International Centre for Islamic Economics, Jeddah-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশে Bangladesh Islamic Bankers Association ও Islamic Economic Research Bureau বেসরকারী পর্যায়ে কিছু কাজ করছে।

এ প্রসঙ্গে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে সাধারণভাবে যে সব ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর করা দরকার। অনেকের ধারণা, ইসলামী অর্থনীতি মানে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আরব দেশে যে অর্থব্যবস্থা চালু ছিল তার পুনরুজ্জীবন করা কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। যারা ইসলামী অর্থনীতি কায়েম করতে চান, তারা কোনো বিগত দিনের অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান না। বর্তমান সময়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলে তা আধুনিকই হবে এবং সে ব্যবস্থায় আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, প্রযুক্তি বিদ্যা (Technology) ও সংগঠনের (Methods of organization) নিয়মই অবলম্বন করা যাবে। এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, উৎপাদন ও সংগঠন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি বিদ্যা কোনো বিশেষ আদর্শের উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে যে কোনো অর্থনীতিতেই এসব উদ্ভাবন ও পদ্ধতিকে সমভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আদর্শিক অর্থব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় বা ইসলামী অর্থনীতি বলতে আমরা কি বুঝতে চাই তাও পরিষ্কার করা দরকার। অনেকে বলে থাকেন, ইসলামের কোনো অর্থব্যবস্থা নেই এবং একটি চিরন্তন নৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা থাকাও উচিত নয়। যদি ব্যবস্থা (System) বলতে অর্থনীতির প্রতিটি দিকের বিস্তারিত ও নির্দিষ্ট নিয়মাবলী বোঝানো হয় তাহলে অবশ্য বলা যেতে

www.pathagar.com

পারে যে, ইসলামে কোনো অর্থব্যবস্থা নেই। কিন্তু ব্যবস্থা (System) বলতে কতকগুলো মূলনীতি ও মূল্যবোধও বোঝানো যেতে পারে যা একটিকে অন্যটি হতে পৃথক করে থাকে। মূলনীতি বা মূল্যবোধের দৃষ্টিতেই অর্থনৈতিক অবাধ স্বাধীনতাকে (Lassie faire) পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে এবং সামাজিক মালিকানাকে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়েছে। ইসলামে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ থেকে অনেক বেশী বিস্তারিত অর্থনৈতিক নিয়মাবলী রয়েছে। কাজেই ইসলামী অর্থব্যবস্থা থাকতে পারে না বলা অত্যন্ত অযৌক্তিক। ইসলামী অর্থনীতির ইসলামিত্ব (Islamicness) হচ্ছে তার মূল্যবোধ এবং তার প্রয়োগনীতিতে। অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি প্রধান ইসলামী মূলনীতি হচ্ছে সুদ নিষিদ্ধকরণ, সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগি, দুস্থদের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা (যাকাত), ব্যবসা ও জীবিকা অনুসন্ধানের অধিকার, অর্থ ও সম্পদ জমাকরণের (Concentration) বিরুদ্ধে শক্ত মনোভাব, ইসলামের মীরাসী ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির প্রতিরোধ (আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার)। আমরা পরে দেখতে পাব যে, ইসলামী রাষ্ট্র নাহি আনিল মুনকার (দুর্নীতির প্রতিরোধ)-এর ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমকালীন সব অর্থনৈতিক জুলুম ও অনাচার প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। অনেকে মনে করেন যে, কোনো সমস্যার কেবল একটিই ইসলামী সমাধান হতে পারে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র একই সমস্যাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারে। কোনো লেখকের পক্ষে ইসলামী অর্থনীতির বিশদ বিধান (details) রচনা করে সেটিকে একমাত্র মডেল বা চূড়ান্ত মনে করা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক দাবী। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর মূল পাঠ (text) থেকে পাওয়া বিধানের অতিরিক্ত বিশদ বিধান তৈরী করার জন্য লেখকরা যে ইজতিহাদ করবেন তাতে ব্যাপক মতপার্থক্য হতে পারে। সুতরাং গত হাজার বছরের অর্থনৈতিক বিবর্তন ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে ইসলামী অর্থনীতির বিশদ মডেল তৈরী করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে এসব মতপার্থক্য দেখা দেয়ার সম্ভাবনা বেশী তার মধ্যে ভূমি সংস্কার, অর্থনীতিতে সরকারী ভূমিকা, সুদবিহীন অর্থনীতির সঠিক মডেলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইসলামী চিন্তাবিদদের এসব মতপার্থক্য সম্বন্ধে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ঐক্যের গুরুত্ব লাঘব করা নয়। তবে ঐক্য ও সমঝোতা কেবল পরেই বিতর্কের মধ্যে আসতে পারে, পূর্বে নয়।

অর্থনীতিতে সুদের প্রভাব

সামাজিক সুবিচার বা আদল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বা অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সব শিক্ষার উদ্দেশ্যই সামাজিক

www.pathagar.com

সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক সুবিচার কায়েম করার জন্যই ইসলামে সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন :

সুদখোরদের অবস্থা হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শয়তান তার নিজ প্রভাব দ্বারা মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, তারা বলে, ব্যবসা ও সুদ একই ধরনের। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। যারা আল্লাহর আদেশ মোতাবেক এরপর সুদী কারবার হতে বিরত হবে, তারা পূর্বে যা নিয়েছে, তা তাদেরই থাকবে। এ ব্যাপারে তাদের সমস্যা আল্লাহর নিকট সোপর্দ কিন্তু যারা এ আদেশের পরেও সুদী কারবার করবে তারা জাহান্নামী, জাহান্নামেই তারা চিরকাল থাকবে। (আল বাকারা : আয়াত ২৭৫)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তবে সুদ বাবদ যা পাওনা আছে, তা ছেড়ে দাও। যদি তোমরা তা না করো, তবে তোমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। আর যদি তোমরা তওবা করো তবে তোমরা নিজেদের আসল মূলধন ফেরত পাবে। কারো ওপর জুলুম করো না, তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না।

(আল বাকারা : আয়াত ২৭৮-৭৯)

সূরা আল ইমরানে রয়েছে :

হে ঈমানদারগণ! দ্বিগুণ, চতুর্গুণ সুদ খেয়ো না। দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি পাবার নিমিত্ত আল্লাহকে ভয় করতে থাক। (আল ইমরান : আয়াত ১৩০)

এখানে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ সুদের উল্লেখের অর্থ এই নয় যে, দ্বিগুণ, চতুর্গুণ সুদ না হলে তা বৈধ হবে। তা হতে পারে না। এটা সূরা বাকারার আয়াতসমূহ হতে স্পষ্ট হয়। এখানে আরবে সে সময় যা কিছু বাস্তবে ঘটতো তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা কোনো নতুন বিষয় নয়। আগেও একবার ইসলামের প্রথম যুগে অর্থনীতিকে সুদমুক্ত করা হয়েছিল। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব দেশে অর্থনীতি সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো । সব ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত লেনদেন সুদের ভিত্তিতে হতো। রাসূলুল্লাহ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীন অর্থনীতিকে সুদবিহীনভাবে গড়ে তোলেন। সুতরাং আমাদের জন্য সুদহীন অর্থ-ব্যবস্থা নতুন কিছু নয় বরং আমরা জানি যে, এর মডেল ইতিহাসে ছিল। আমাদের কাজ হচ্ছে সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থাকে নতুনভাবে পুনঃ প্রবর্তন করা।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অষ্টম শতাব্দী হতে শুরু করে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি সুদ ছাড়াই পরিচালিত হতো। কেননা সে সময় মুসলিম বিশ্বই সবচেয়ে উন্নত ছিল; কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যেও। সর্বোপরি পাশ্চাত্য হতে যে সব পণ্য প্রাচ্যে আসতো তার পথও (Trade route) ছিল মুসলিম বিশ্বের ভেতর দিয়েই। কেননা পাশ্চাত্য তখনো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশ আরো পরে শুরু হয়েছিল। মুসলিম অর্থনীতি তখন ইসলামের ভিত্তিতে সুদ ছাড়া পরিচালিত হতো; কেননা মুসলিম বিশ্বের আইন ব্যবস্থা ছিল তখন ইসলামী ফিকাহ। যদিও খেলাফতের নামে বাদশাহী তখন কায়েম ছিল, তথাপি ইসলামী আইনের ভিত্তিতেই সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালিত হতো। যদি অষ্টম শতাব্দী হতে চর্তুদশ শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত উন্নত এক অর্থনীতি সুদ ছাড়া চলতে পারে তবে আজও সুদ ছাড়া একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত অর্থনীতি পরিচালনা করা যে সম্ভব, এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

এরপর আমি সুদভিত্তিক অর্থনীতির মন্দ প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করব। লাভ হোক বা না হোক, ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার নিকট হতে নির্দিষ্ট হারে সুদ দাবী করা নিঃসন্দেহে একটি জুলুম। এর ফলে অনেক ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক ভরাডুবি ঘটে যা সমাজের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। অনেকে মনে করতে পারেন যে, আজ-কাল ব্যাংকে যারা টাকা জমা রাখেন, তারা ব্যাংক হতে সুদ পেয়ে থাকেন এবং এ সুদ দেয়ার ফলে ব্যাংকের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়; কেননা ব্যাংক যে সুদ জমাকারীদের দিয়ে থাকে তার দ্বিগুণ সুদ ঋণগ্রহীতার উপর চাপিয়ে দেয়। এ পরিস্থিতিতে ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি যদি মন্দার সম্মুখীন হয়, তবে সে আর সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে অনেক সময় সক্ষম হয় না। ফলে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার শিল্প বা বন্ধক দেয়া বাড়ী ও সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করে থাকে। এভাবে সুদ ব্যবস্থার কারণে অনেকের সর্বনাশ হয়ে থাকে। কাজেই সুদ যে ইনসাফের সম্পূর্ণ খেলাফ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ সুদের কারণেই দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক রকম চড়া হয়ে থাকে। সুদবিহীন ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদী অর্থনীতিতে সুদও মূল্যের উপর যোগ করা হয়। কাজেই অধিকাংশ দ্রব্যের ওপর কেবল সুদের কারণেই জনগণকে অতিরিক্ত দাম দিতে হচ্ছে। সুদী ব্যবস্থার আর একটি ভয়াবহ দিক হচ্ছে এই যে, এর ফলে পুঁজি সামান্যসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়, যা কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ খেলাফ। পুঁজির এ পুঞ্জিভূত হওয়া কোনো চেষ্টা

www.pathagar.com

তদবীরের ফল নয়। সুদের এটি একটি বৈশিষ্ট্য যে, হাত গুটিয়ে বসে থাকা একটি শ্রেণীকে এ ব্যবস্থা শ্রম ছাড়া সম্পদ বৃদ্ধির এক সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। যে কেউ প্রচুর বিত্ত-সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য কোনো সূত্রে পেয়ে গেলে সুদের বদৌলতে টাকা ব্যাংকে রেখে বিনা পরিশ্রমে সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। ফলে এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অকর্মন্যতা, বিলাসিতা ও দুষ্কর্মের প্রসার দেখা দেয়। আর যে সম্পদ সে এভাবে পেয়ে থাকে তা সবই সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের ঘর্ম ও রক্তধারা নিঃসৃত। এমনিভাবে দু'টি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যার একটি হচ্ছে, পুঁজি অপরিমিত ও অস্বাভাবিকভাবে জমা হতে থাকা, অপরটি হচ্ছে, ধনী-গরীবদের মধ্যে অস্বাভাবিক শ্রেণী-পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া। এতে সামাজিক শান্তি নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। মালের জমা হওয়া সম্বন্ধে জার্মানীর প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডক্টর সাখত, যিনি জার্মানীর রাইখ ব্যাংক-এর গভর্নর ছিলেন, এলজেবরার একটি হিসাব দ্বারা প্রমাণ করেন যে, সুদী ব্যবস্থায় দুনিয়ার সমগ্র ধন-দৌলত একটি সুদখোর শ্রেণীর হাতে চলে যেতে বাধ্য। এর কারণ হচ্ছে সুদের ভিত্তিতে ঋণদাতা সর্বদাই লাভবান হয়ে থাকে আর গ্রহীতা হয়ে থাকে কখনো লাভবান, কখনো ক্ষতির সম্মুখীন। (সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, পৃ. ৩৫৪)

অথচ শরীকদারী নীতি ও মুনাফার ভিত্তিতে যে অর্থনীতি গড়ে উঠবে তাতে একটি শ্রেণীর হাতে পুঁজি ক্রমাগত জমা হতে থাকার বা কর্মবিমুখ একটি শ্রেণী গড়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

সুদের অন্য এক মারাত্মক দিক হচ্ছে, এর ফলে অর্থনীতিতে বারবার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন হতে থাকে (Business cycle) যার ফলে অর্থনীতিতে সব সময় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে, তখন সুদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে যখন সুদের হার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তখন ঋণগ্রহীতা যদি হিসাব করে দেখে যে, অতিরিক্ত সুদের হারের কারণে লাভের সম্ভাবনা কম, তখন সে আর ঋণ নিতে চায় না। এর ফলে পুঁজি খাটানোতে ভাটা পড়ে, উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাঁটাই হয় এবং সাধারণভাবে ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেয়। এরপর আবার যখন ব্যাংক দেখতে পায় যে, পুঁজির চাহিদা কমে গেছে, তখন অপারগ হয়ে আবার সুদের হার কমিয়ে দেয়। তারপর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি নতুন করে পুঁজি নিয়ে বিনিয়োগে আত্মনিয়োগ করে। এমনিভাবে অর্থনীতিতে ক্রমাগতভাবে মন্দা ও তেজীভাব সৃষ্টি হতে থাকে। এ পরিস্থিতি যে অর্থনীতি ও জনকল্যাণের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। সুদী ব্যবস্থার অন্য একটি বিপদজনক দিক হচ্ছে এ ব্যবস্থায় ফটকাবাজারী (Speculation) উৎসাহিত হয়। অন্যদিকে মুনাফার ভিত্তিতে যে

www.pathagar.com

ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাতে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা গ্রহণ করা হয়। এ ব্যবস্থায় জামানত (Security) দেয়াই যথেষ্ট নয়, লাভের নিশ্চয়তাও থাকতে হবে। কিন্তু সুদী অবস্থায় জামানত দিতে সক্ষম হলেই অন্য সতর্কতার কোনো প্রয়োজন নেই। আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো ক্ষেত্রে ঋণ না দেয়ার যে নির্দেশ দিয়ে থাকে তা খুব কমই পালিত হয় এবং এসব ফাঁকি দিয়ে ফটকাবাজারীর জন্য ঋণ নেয়া বিশেষ কঠিন হয় না। কেননা, যেহেতু সুদী ব্যবস্থায় জামানতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়, সে জন্য বাস্তবে টাকার কি ব্যবহার হচ্ছে তার উপর নজর রাখা হয় না। ফলে সুদী ব্যবস্থার আড়ালে বিশেষ করে বিভিন্ন পণ্য মওজুদের মাধ্যমে ফটকাবাজারী কায়েম হয়ে থাকে যা দ্রব্যমূল্য ও অর্থনীতিকে অস্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করে জনসাধারণের দুর্দশার কারণ হয়।

অর্থনীতির উপর সুদের খারাপ প্রভাব খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীর সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং এবং আনোয়ার ইকবাল কোরেশীর *ইসলাম এন্ড দি থিওরী অব ইন্টারেস্ট* পুস্তক দুইটি দেখা যেতে পারে।

অর্থনীতিতে সুদ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে না। ১৯৩৫ সনে কিনস্ (Keynes)-এর The General Theory of Income. Employment and Interest পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মনে করা হতো যে, সুদ হচ্ছে সঞ্চয়ের মূল কারণ। কিন্তু কিনস দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সঞ্চয়ে সুদের কোনো ভূমিকা নেই। সব আধুনিক অর্থনীতিবিদই আজ তা সত্য বলে মনে করেন।

বর্তমানে সুদ কেবল ঋণদান ও ঋণগ্রহণের একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে এবং এ ভিত্তিতেই ঋণ দেয়া নেয়া হচ্ছে। অবশ্য ঋণ দানের এ ভিত্তিটি যে কত ক্ষতিকর তা তো আমরা আগেই দেখেছি। অথচ শরিকদারী এবং মুনাফার সম্পর্ক যে ঋণ দেয়া-নেয়ার আরো সুন্দর ও ন্যায়সংগত ভিত্তি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর ফলে অর্থনীতিতে কোনো খারাপ প্রভাবও দেখা দেবে না।

সুদমুক্ত অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশসহ প্রায় সব মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংক কায়েম করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যাংকের অনেক দেশী-বিদেশী শাখাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ইসলামী ব্যাংক এখন বিশ্বে একটি স্বীকৃত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা অপেক্ষা এটা অনেক ভালো ফল দেখাতে পেরেছে। আশা করা যায় যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী ও কার্যক্ষম হয়ে উঠবে।

যাকাত ও সামাজিক নিরাপত্তা

নিরাপত্তা মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। নিরাপত্তা না থাকলে কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠতে ও বিকাশ লাভ করতে পারে না। ইসলাম তাই নিরাপত্তা

www.pathagar.com

চায়। ইসলামের অর্থই হচ্ছে শান্তি, অর্থাৎ ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থা যেখানে নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলাম নিরাপত্তা চায় বলেই সে যে সব উপাদান নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করতে পারে যেমন মদ, জুয়া, অশ্লীলতা ইত্যাদিকে হারাম করেছে। এ জন্যই ইসলামী দণ্ডবিধিতে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির (ফাসাদ ফিল আরদ) জন্য প্রয়োজনে হত্যার বিধান রাখা হয়েছে। (সূরা মায়েদা : আয়াত ৩৩)

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তার একটি প্রধান অংশ। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পরিভাষার দিক থেকে সামাজিক নিরাপত্তার অর্থ হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিরাপত্তা দান। তাই ইসলাম অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন : তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে।

(সূরা বাকারা : আয়াত ২৭৫)

কুরআন ও হাদীসে বহু স্থানে মানুষকে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

যারা কোনো কারণে নিজেদের প্রয়োজনীয় জীবন ধারণের ব্যবস্থা করতে পারে না তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত, তাদের আত্মীয়-স্বজনের ও স্থানীয় সমাজের। ইসলাম সমাজবদ্ধ জীবনে বিশ্বাস করে এবং সমাজের প্রত্যেকের একে-অপরের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের ঘোষণা : এবং নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে তার হক দাও।

(বনী ইসরাইল : আয়াত ২৬)

অতএব নিকটাত্মীয়কে এবং মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে তার হক দাও।

(আররূম : ৩৮)

পূর্ব ও পশ্চিমের দিক মুখ করে দাঁড়ানো কোনো প্রকৃত কল্যাণের কাজ নয়। বরং প্রকৃত কল্যাণের কাজ করল তারা যারা আল্লাহ, পরকাল, কিতাব, ফিরিশতা ও নবীদের প্রতি ঈমান আনল এবং ধনমাল আল্লাহর ভালোবাসায় নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, দরিদ্র, প্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্য দান করল। এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করল। (বাকারা : আয়াত ১৭৭)

ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বা সামাজিক প্রচেষ্টা অপ্রতুলতার কারণে যারা অভাবগ্রস্ত থাকবে বা দুরবস্থার সম্মুখীন হবে তাদের অসুবিধা দূর করা এবং তাদের পুনর্বাসন করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার। (বুখারী)

www.pathagar.com

এ পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে খিলাফতের দায়িত্ব হিসাবে ইসলামী সরকারের। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের শিক্ষা নিম্নরূপ :

পৃথিবীতে চলৎশক্তিসম্পন্ন এমন কোনো জীব নেই যার রিযিক দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর নয়। (সূরা হুদ : আয়াত ৬)

তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর সেই ধন-সম্পদ থেকে যাতে তিনি তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করেছেন।
(আল হাদীদ : আয়াত ৭)

এ পর্যায়ে রাসূলে করীমের (স) ঘোষণা হচ্ছে :

জেনে রাখো ! তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

যে লোক ধন-মাল রেখে মরে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে এবং যে লোক অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে যাবে তার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম তিন পর্যায়ে সামাজিক বিশেষ করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে।

প্রথমত, ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টা;

দ্বিতীয়ত, সামাজিক ব্যবস্থা এবং

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা (তার শিক্ষা ও আইন ব্যবস্থাসহ) কার্যকর করা সম্ভব হলে কোনো মুসলিম সমাজেই কোনো ধরনের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিতে পারে না।

ইসলামী সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কি বোঝাবে? এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা : আমরা বনী আদমকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি।
(বনী ইসরাইল)

এ প্রসঙ্গে রাসূল করীমের (স) ঘোষণা হচ্ছে :

তোমাদের জান, তোমাদের মাল ও তোমাদের সম্মান পবিত্র ও সম্মানার্হ।
(বিদায় হজ্জের ভাষণ : সিহাহ সিত্তাহ)

কাজেই ইসলামী সমাজে এমন এক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে যেখানে জান-মালই শুধু বিপদমুক্ত হবে না বরং প্রত্যেক মানুষ ইজ্জতের সঙ্গে বাস করতে পারবে। এ জন্য ইসলামের ফকীহগণ খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও বিবাহের ব্যবস্থাকে মৌলিক প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবন হাজম লিখেছেন :

www.pathagar.com

প্রত্যেক এলাকার ধনবান লোকদের উপর সেখানকার দরিদ্র জনগণের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। শাসক তাদেরকে এ কাজ করতে বাধ্য করবেন এবং যাকাত বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ এ দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট না হলে ধনীদের নিকট হতে আরো সম্পদ সংগ্রহ করে তাদের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, শীত-গ্রীষ্মের পোশাক, বৃষ্টি, রৌদ্র ও পথিকদের বৃষ্টি হতে রক্ষাকারী একটি ঘরের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। (আল মিলাল ওয়ান নিহাল)

জানের নিরাপত্তা ঘোষণার মধ্যেই চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর শিক্ষা তো নবী করীম (স) নিজেই সবার উপর ফরজ করেছেন।

প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর উপর শিক্ষা ফরজ। (আল হাদীস)

এ আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিখ্যাত আলিম ও ফকীহ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম লিখেছেন, পুরুষ ও নারীর যথাসময়ে বিবাহ হওয়া এ পর্যায়েরই মৌলিক প্রয়োজন। (ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, ১ম সংস্করণ, পৃ -৯৩)

সামাজিক নিরাপত্তার প্রধান প্রধান ব্যবস্থা

ক. এ পর্যায়ে ইসলামের সবচেয়ে প্রধান ও মশহুর ব্যবস্থা হচ্ছে যাকাত। যাকাত কোনো সাধারণ কর বা শুল্ক নয়। সব কাজে যাকাতকে ব্যবহার করা যায় না। যাকাত হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি। যাকাতের মাধ্যমে সমাজকে দারিদ্র্য থেকে ইসলাম উদ্ধার করতে চায়। যাকাতের হকদার হচ্ছে যারা কর্মক্ষমহীন এবং যারা কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উপার্জনহীন অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণ উপার্জন করতে পারছে না। এ প্রসংগে আল্লাহ পাক বলেছেন :

যাকাত পাবে ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করা দরকার, ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত এবং নিঃস্ব পথিক। আল্লাহর পথে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজেও এ অর্থ খরচ করা হবে।

(সূরা তওবা : আয়াত ৬০)

খ. যাকাতের মাধ্যমে সব অভাবগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অভাব দূর করা ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করা সম্ভব। যাকাত অভাবগ্রস্তকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দিতে হবে যাতে সে আর অভাবগ্রস্ত না থাকে। এ পর্যায়ে কোনো কোনো ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, যাকাতের যে গ্রহীতা তাকে এক বৎসরের প্রয়োজন পূর্ণ করে দিতে হবে। কেউ কেউ সারা জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়ার কথা বলেছেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) মত হচ্ছে- যখন দেবেই, তখন সচ্ছল বানিয়ে দাও। (প্রাগুক্ত)

www.pathagar.com

গ. যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র জনতার পুনর্বাসন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। সারা মুসলিম বিশ্বের দেশভিত্তিক বা সামগ্রিক আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সব তথ্যও আমাদের কাছে নেই। এখানে কেবল বাংলাদেশের আদায়যোগ্য যাকাতের একটি নিম্নতম হিসাব পেশ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে দুই কোটি টন খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়। এর অন্তত ৭৫ লক্ষ টন সচ্ছল কৃষকগণ উৎপাদন করে থাকেন। যদি এই ৭৫ লক্ষ টনের উপর অর্ধ ওশর (৫%) আদায় করা হয় তার পরিমাণ হবে ৩ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টন খাদ্য-শস্য। যার নীচের পক্ষে মূল্য হচ্ছে ৬০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাট, চা, রবিশস্য, তামাক ও অন্যান্য ফসল যার যাকাতযোগ্য পরিমাণ একহাজার কোটি টাকা হবে। এতে শতকরা ৫ ভাগ হারে ৫০ কোটি টাকার যাকাত আদায় হতে পারে। এ হিসাবের জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে, সব জমিতেই সেচ দেয়া হচ্ছে এবং এ জন্য জমির মালিকগণ শতকরা ১০ ভাগ ওশর না দিয়ে শতকরা ৫ ভাগ অর্ধ ওশর দিচ্ছে। তেমনিভাবে যাকাতযোগ্য ব্যবসায়ী পণ্য, নগদ অর্থ এবং স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার হতে যথাক্রমে ৫০০ কোটি, ১০০০ কোটি ও ২৫০ কোটি টাকার যাকাত আদায় হতে পারে। এভাবে অন্যান্য বনজ সম্পদ, পশু সম্পদ এবং সমুদ্র হতে প্রাপ্ত মাছ ইত্যাদি বাদ দিলেও অন্তত ২,৪০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে। নিম্নে এ সম্পর্কে একটি ছক দেয়া হলো :

যাকাতযোগ্য পণ্য, সম্পদ ও অর্থের ২০০০ সনের হিসাব :

ক্র:	সম্পদ	যাকাতযোগ্য পরিমাণ/মূল্য/অর্থ	যাকাতের পরিমাণ ও মূল্য (টাকায়)	মন্তব্য
১.	খাদ্য-শস্য	৭৫ লক্ষ টন	৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন (মূল্য ৬০০ কোটি টাকা)	শতকরা ৫ ভাগের মূল্য
২.	অন্যান্য শস্য	১০০০ কোটি টাকা	৫০ কোটি টাকা	ঐ
৩.	ব্যবসায়ী/শিল্প পণ্য	২০,০০০ কোটি টাকা	৫০০ কোটি টাকা	শতকরা ২.৫ % হারে
৪.	নগদ অর্থ	৪০,০০০ কোটি টাকা	১০০০ কোটি টাকা	ঐ
৫.	স্বর্ণ/স্বর্ণালংকার	১০,০০০ কোটি টাকা	২৫০ কোটি টাকা	ঐ

ঘ. যাকাতের এ পরিমাণ অর্থ যদি প্রতি বৎসর কেবল দরিদ্র জনতাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান, কর্মে নিয়োগ ও পুনর্বাসনে ব্যয় করা হয় তবে কয়েক বৎসরেই বাংলাদেশে ছিন্নমূল বলে কিছু থাকবে না। অবশ্য যাকাতের অর্থ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা যায় না। সে জন্য অন্য কর ও শুল্কও আদায় করতে হবে।

www.pathagar.com

ঙ. যাকাতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে রয়েছে :

যখন আমরা তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তখন তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৪১)

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাসূলকে আল্লাহ আদেশ করেছেন :

তাদের মাল থেকে যাকাত আদায় করুন। (সূরা তওবা : আয়াত ১০৩)

আয়াতে সাদাকাত' শব্দের অর্থ ফকীহগণ যাকাত করেছেন, কেননা আয়াতে 'খুজ' ক্রিয়াটি আদেশবাচকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যা কেবল বাধ্যতামূলক কাজের জন্য প্রযোজ্য। আর আমরা জানি যে, একমাত্র বাধ্যতামূলক সাদাকা হচ্ছে যাকাত। (ইউসুফ আল কারদাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, পৃ. ৩১-৩৭, ২য় খন্ড)

সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের দ্বিতীয় প্রধান উপায় হবে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের অন্যান্য সম্পদ-যদি যাকাত, স্থানীয় সমাজ ও আত্মীয় স্বজনের সাহায্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে অপর্যাপ্ত হয়। বায়তুল মালের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

বায়তুল মালের সম্পদ সাধারণ মুসলমানের সম্পদ। বায়তুল মালের এ সম্পদ হতে কেবল মুসলমানই নয়, অমুসলিমদেরও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। হযরত ওমর ফারুকের খিলাফতকালে ইরাকের হীরাবাসী খৃস্টানদের সঙ্গে যে চুক্তি হয় তাতে লেখা ছিল :

যে বৃদ্ধ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কিংবা কোনো বিপদে পড়ে গেছে অথবা পূর্বে ধনী ছিল এবং স্বচ্ছল ছিল এখন দরিদ্র হয়ে পড়েছে আর সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করেছে এরূপ ব্যক্তির উপর, সে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক থাকবে- ধার্য জিজিয়া প্রত্যাহৃত হবে এবং মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে তার ও তার পরিবার-পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে।

(প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪, আবূ ইউসূফের কিতাবুল খারাজ থেকে)

হযরত ওমর ফারুক (রা) অন্য এক সময় একজন অসমর্থ জিম্মী সম্পর্কে বায়তুল মালের দায়িত্বশীল কর্মচারীকে লিখে পাঠান :

এই লোকটি ও তার উপর ধার্য জিজিয়া ইত্যাদি করের বোঝা সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা কর। আমরা লোকটির উপর কিছুমাত্র সুবিচার করিনি, তার যৌবনকালের উপার্জনে সকলে উপকৃত হয়েছি, আর এখন তার বার্ধক্যকালে লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য তাকে ত্যাগ করেছি। অথচ আল্লাহ তো বলেছেন,

www.pathagar.com

সাদাকাসমূহ ফকীর ও মিসকীনদের জন্য। ফকীর বলতে মুসলমান দরিদ্র লোককে বোঝায়। আর এ লোকটি হচ্ছে আহ্‌লি কিতাব থেকে মিসকীন।

(প্রাগুক্ত, পৃ ৮৬, আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ থেকে)

ছ. বর্তমান যুগে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যকর করার জন্য আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা কায়েম করা যেতে পারে, যাতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো সংহত ও প্রসারিত হয়। এ প্রসঙ্গে বীমা ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবন বীমাকেও সুদমুক্ত ও জুয়ামুক্তভাবে সংগঠিত করা সম্ভব। আধুনিক অনেক ফকীহই এই মত পোষণ করেন।

(১.Nazatullah Siddiqui, Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature: Islamic Foundation UK. ২. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামী অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা)।

প্রকৃতপক্ষে এর ফলে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ও যাকাত অর্থের উপর চাপ কমবে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি ইসলামী বীমা কোম্পানী মধ্যপ্রাচ্যে কাজ শুরু করেছে।

জ. বর্তমান যুগে ইসলামী ব্যাংকও সামাজিক নিরাপত্তা কায়েমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামী ব্যাংক অভাবগ্রস্ত কর্মক্ষম যুবক ও শ্রমিকদের মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। এ জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে খুব বেশী অর্থ দিতে হবে না। এ পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ যুবককর্মীকে বেকারত্ব থেকে মুক্ত করে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। এটাও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ব্যাপক সহায়তা করবে।

ঝ. এসব প্রতিষ্ঠান কায়েম করা প্রকৃত পক্ষে কুরআনের দৃষ্টিতে মারূফ কায়েম করা হিসেবেই গণ্য হবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে ক্ষমতা দিয়েছি তারা... সৎকাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। (সূরা হজ্জ : আয়াত ৪১)

ঞ. বাস্তব সামাজিক নিরাপত্তা ও যাকাত ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে রাষ্ট্রকে এর দায়িত্ব নিতে হবে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, যাকাত প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যতটুকু যাকাত রাষ্ট্র কর্তৃক আদায় করা অধিকাংশ ফকীহ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, ততটুকু যাকাত বাধ্যতামূলকভাবেই আদায় করতে হবে। যাকাতের কিছু অংশ ফকীহদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে আদায় করার কথা বলেছেন। (ইউসুফ আল কারদাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় খণ্ড)

এ জন্য সব মুসলিম দেশে প্রয়োজনীয় যাকাত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করতে হবে।

www.pathagar.com

ট. যাকাত আদায়কে সহজ করার জন্য যাকাত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান জনগণকে দিতে হবে। তবেই সালাত আদায় করার মতো যাকাত আদায় করা জনগণের জন্য সহজ হবে। জনগণ এ ব্যাপারে অনেক কিছুই জানে না। এ সম্পর্কে ইউসুফ আল কারদাভী লিখেছেন :

(যাকাত সম্পর্কে) আরও কতকগুলো বিষয় জানার প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুনভাবে এ যুগে দেখা দিয়েছে। প্রাচীনকালীন ফিকাহবিদগণ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বড় বড় শিল্প কারখানার উৎপাদন, জাহাজ, ভাড়া বাড়ী, হোটেল-রেস্তোরাঁ, প্রেস ইত্যাদি নতুন ধরনের সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের ভূমি যে খারাজী ভূমি নয় বরং উশরী ভূমি, এ সম্পর্কেও জনগণের জ্ঞানের অভাব আছে। জনগণকে জানানো দরকার যে, বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের জমির ফসলের উপর ওশর দান ফরয।

(ক. ইউসুফ আল কারদাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, খ. সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী, *ওশরের শরীয়তী বিধান*, আধুনিক প্রকাশনী)।

তেমনিভাবে যাকাত প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাত কি কি সম্পদে ফরয, নিসাব কি, যাকাতের বৎসর কিভাবে গণনা করতে হয়- এ সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান জনগণকে দিতে হবে। (ইউসুফ আল কারদাভী, প্রাগুক্ত)

সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যাকাত সংক্রান্ত এ আইন-কানুনকে বিস্তারিতভাবে পড়বার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠ. যাকাত ব্যবস্থা কার্যকরণে কেবল সরকারী কর্মচারীর উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না; তাতে যাকাত বিভাগের প্রশাসনিক খরচ বেশী হবে। কাজেই যাকাত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক মুসলিম দেশকে বেসরকারী পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের কমিটির ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী যাকাত কর্মচারীগণ তাদের কাজ তদারক করবেন।

ড. যাকাত বিভাগে কর্মরতদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার হবে। এ প্রশিক্ষণের মধ্যে যাকাতের বিধি-বিধান, প্রশাসনিক আইন-কানুন ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হবে। যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের যথাযোগ্য বেতন দিতে হবে, যেন তারা অসততার পথে পা না বাড়ায়।

ঢ. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য ইসলামী বীমা ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এ কাজ বেসরকারী ও সরকারী দুই পর্যায়েই হতে হবে।

ণ. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইসলামী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। এ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্রত্যেক সরকার ও সমাজের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা কর্তব্য। এর অভাবেই আজ মুসলিম সমাজে এত দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকিং-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা, বিশেষ করে বাংলাদেশে এর পটভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা যায়। আমার বিশেষ করে মনে পড়ে, আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম এবং একটি ছাত্র সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলাম তখন দু'টি প্রশ্ন মনে উদয় হতো এবং বিব্রত করতো। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে যখন ঢাকা কলেজে ছিলাম তখনও হতো। একটি প্রশ্ন ছিল যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং যেহেতু ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্ভব নয় সুতরাং একটি ইসলামী রাষ্ট্রও সম্ভব নয়। যেহেতু ইসলামী সংগঠন থেকে বলা হতো যে, আমাদের দাবী হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র বা হুকুমাতে ইলাহিয়া অর্থাৎ খেলাফত কায়েম করা। খেলাফত অর্থ এই নয় যে, শুধু একজন খলিফা মনোনয়ন করা। খেলাফত মানে খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম করা। এই খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল- যার মধ্যে মানবতা থাকবে, যার মধ্যে ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সকল বৈশিষ্ট্য থাকবে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগতো যে, এটি সম্ভব নয়। কিন্তু যখন পাকিস্তানে ১৯৫৬ সনে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়ে গেল এবং শাসনতন্ত্র দেশের আলিম সমাজও গ্রহণ করলেন তখন ইসলামী শাসনতন্ত্র তথা ইসলামী রাষ্ট্র সম্ভব নয়- এই প্রশ্ন সবার মন থেকে সরে গেল। যে ভাবনা সারাক্ষণ তাড়া করতো, ইসলামী শাসনতন্ত্র বা ইসলামী রাষ্ট্র একেবারেই সম্ভব নয়- তা আর রইল না। এমনকি আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে যে ব্যক্তি এক সময় বলেছিলেন যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব নয়, সম্ভব হলে আপনারা প্রণয়ন করে দেখান, যখন ১৯৫২ সালে সকল মতের আলিম একত্রিত হলেন এবং তাঁরা ২২ দফা মূলনীতি তৈরী করে দিলেন তখন (এই ব্যক্তি মরহুম এ কে ব্রোহী) তিনি পরবর্তীকালে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে দাঁড়ান এবং পরবর্তীকালে তিনি একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবেই পরিচিত হয়ে যান। এটা ছিল একটা দিক।

দ্বিতীয় দিক যেটা লোকে মনে করত (আমাদের ছাত্র জীবনে), যেহেতু ইসলাম সুদকে স্বীকার করে না, সেহেতু ইসলামী ব্যাংক সম্ভব নয় এবং যেহেতু ব্যাংক সম্ভব নয় সুতরাং ইসলামী অর্থনীতিও সম্ভব নয়। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের এই যে ধারণা, তা আমাদের পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহপাকের অসংখ্য মেহেরবানী, যে প্রশ্নটি আমাদেরকে বিব্রত করেছিল ১৯৭০ পর্যন্ত এমনকি ১৯৭৪-৭৫ পর্যন্ত-যখন ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল মধ্যপ্রাচ্যে এবং তারপরে যখন এ ধারণা বাংলাদেশে নিয়ে আসা হলো, এই ধারণা যখন ব্যাপক

www.pathagar.com

হলো এবং আল্টিম্যাটলি যখন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে চালু হয়ে গেল, তখন থেকে লক্ষ্য করছি আমরা যে প্রশ্নে বিব্রত হচ্ছিলাম তা আর রইল না।

ব্যাংক যখন হয়ে গেল এবং কাজ শুরু করলো (১৯৮৩) এবং বাংলাদেশে যখন ইসলামী ব্যাংকের কাজের মাধ্যমে জনগণ দেখলো যে, ইসলামী ব্যাংক একটি প্র্যাকটিকেবল মাধ্যম এবং এরা ভালো করে একটি ব্যাংক চালাতে পারে, তারপর থেকে লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশে ইসলামপন্থী লোকদের বিরুদ্ধে বা ইসলামপন্থী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে বা ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে যাই বলা হোক না কেন কিন্তু এ কথা আর বলা হচ্ছে না যে, ইসলামী ব্যাংক সম্ভব নয়। এ কথা বলা হচ্ছে না যে, ইসলামী অর্থনীতি সম্ভব নয়। এটা যে কত বড় বিপ্লব তা আমরা অনুধাবন করতে পারছি না। আমরা যদি ঐতিহাসিকভাবে এটাকে দেখি পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া এবং ইরানে ১৯৭৯ সনে শাসনতন্ত্র হয়ে যাওয়ার ফলে একটা মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি হলো। যার ফলে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্ভব নয়- এই যে ধারণা, তা চলে গেল।

এখন এ কথাটি তারা বলতে পারেন যে, আমরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা আমাদের জন্যে গ্রহণযোগ্য মনে করি না, এটা হলো অন্য প্রশ্ন। কিন্তু ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্ভব নয়, ইসলামী অর্থনীতি সম্ভব নয়- এই অভিযোগ চলে না। আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া যে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এবং বিশ্বব্যাপী এই চিন্তা নেই যে, ইসলামী অর্থনীতি অচল। যতটুকু মনে পড়ে, ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় ইকোনোমিস্টে *সার্ভে অব ইসলাম* নামে একটি দশ বার পৃষ্ঠার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তারা অনেকটা বিস্তৃত আলোচনা করে, সেটা আমাদের অনেকের দেখা দরকার ছিল। তারা সে লেখায় বলে যে, দুইটি জিনিস এখন আমরা ইসলাম থেকে নিতে পারি। তার মধ্যে একটি হলো, আমরা ইসলামী ব্যাংকিং নিতে পারি। তার মানে তারা মেনে নিয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং ইজ সুপিরিয়র টু কনভেনশনাল ওয়েস্টার্ন মডার্ন ব্যাংকিং। কারণ ওয়েস্টার্ন মডার্ন ব্যাংকিং-এর যে সংকীর্ণতা বা অসুবিধা অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, ওয়েস্টার্ন মডার্ন ব্যাংকের যে সুবিধা তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু সুবিধা আছে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায়। মুদারাবা, মুশারাকা, বাই মোয়াজ্জাল- এ সব ভালো ভালো ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যা তারা গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে তারা যুক্তি দেখিয়েছে যে, অতীতে আমরা ইসলাম থেকে ইউনিভার্সিটির আইডিয়া নিয়েছিলাম। স্পেন, আন্দালুসিয়া থেকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির অনেক উন্নত বিষয়ের আইডিয়া নিয়েছিলাম। এখন আমরা ইসলামী ব্যাংকিং-এর আইডিয়াও গ্রহণ করতে পারি।

www.pathagar.com

এই আলোচনার সারসংক্ষেপ বলতে পারি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ইম্প্যাক্ট এটা হয়েছে যে, তারা ট্রেড ফাইন্যান্স করতে পেরেছে এবং ফাইন্যান্স সফলভাবেই করেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স করেছে সফলভাবে। ট্রেড ফাইন্যান্স, মুরাবাহার ভিত্তিতে, বাই মুয়াজ্জালের ভিত্তিতে করেছে। তারা রুরাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও একটা বড় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাই ইসলামী ব্যাংকিং এদেশে মোটামুটি সফল- এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। ক্যাশ ওয়াক্ফ (সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লি:) ব্যবস্থায় ক্যাশ নামে যে ধারণাটি নিয়ে আসছে, এটি হিস্টোরিক্যাল। ইসলামী অর্থনীতিতে এটা আছে, সেটা এরা নিয়ে এসেছে। আপনি আপনার ক্যাশ যেমন ধরুন এক লাখ টাকা ওয়াক্ফ করে দিতে পারেন এবং ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারেন যে, এটা এই এই খাতে বা কর্মে এভাবে ব্যয় করতে হবে। ইসলামের এই চালু নেই ব্যবস্থাটাও বর্তমানে তারা চালু করেছে।

বাংলাদেশে লক্ষ্য করছি ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষাসমূহ আস্তে আস্তে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন আজকে অনেক লোক জানে যে, মুশারাকা কি, মুরাবাহা কি, মুদারাবা কি। একটা সময় ছিল যে, এগুলো আমি নিজেও জানতাম না। আমি ইসলামী মুভমেন্ট করি ১৯৫৭ থেকে কিন্তু আমি ইসলামী ইকোনোমির এই টার্মগুলো সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত। অথচ এই সময় পর্যন্ত আমি ইসলামী মুভমেন্টে ছিলাম। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা এগুলোর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করাননি। এটা অত্যন্ত দু:খের সঙ্গে বলতে হচ্ছে। আলিমরাও করাননি। কোনো খুতবাতেও আমি কোনো দিন শুনিনি আলিমরা কোনোদিন কোনো খুতবায় বলেছে যে, মুশারাকা কি, মুদারাবা কি, বাই মুয়াজ্জাল কি? এটাও তো আলিমদের তথা সমাজের একটা ব্যর্থতা। দুশো, তিনশো বছর ধরে আমরা জনগণকে, ইসলামের পরিচিত টার্মগুলো, বিজনেস টার্মগুলোর সঙ্গে পরিচিত করাতে পারিনি। কাজেই মুসলমান হয়েও কত অন্ধত্বের মধ্যে যে অনেকেই আছেন তা কিন্তু তারা জানেন না।

আজকে এই ইসলামী টার্মগুলো পরিচিত হয়ে গেছে। যদিও এগুলোর সম্পর্কে একটা প্রপাগান্ডা আছে (ট্রেডিং মোডটা তারা বুঝতে পারে না)। ব্যবসায় লাভ আর সুদের টাকার উপর টাকা দেয়া যে এক জিনিস নয়, এটা তারা এখনো বুঝতে পারে না। তারা অনেকেই বলেন যে, আমরা একটু ঘুরিয়ে খাই এই যা। এই ভ্রান্ত ধারণাটাও আমাদের প্রচারের মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে দূর করতে হবে। এলিটরা ইসলামী টার্মগুলো মেনে নিয়েছেন। এই দেশে যারা সবচেয়ে বড় পুঁজিপতি, একশ' কোটি, দুইশ' কোটি টাকার মালিক তারাও আজকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে আগ্রহ ভরে অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন। এলিটরা বুঝেছেন

www.pathagar.com

যে, এটা সুবিধাজনক, এতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং, আমি মনে করি ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আমরা একটা বিরাট কাজ করেছি। যারা এই আন্দোলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তারা খুব বড় এবং মহান কাজ করেছেন বলে আমি মনে করি। এটা ইসলামের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় পজিশন এনে দিয়েছে। ইসলামী মুভমেন্টের ক্ষেত্রে বড় একটা বাধা ছিল ইসলামী ইকোনোমি। এই বাধাটাই তারা দূর করে দিয়েছেন।

সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, আমি যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছিলাম তখন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., সমসাময়িক অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যে রেটিংয়ের দিক থেকে নাম্বার ওয়ান ব্যাংকে পরিণত হয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি., আল বারাকা ব্যাংক লি., সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লি., প্রাইম ব্যাংকের দু'টি শাখা আছে, ঢাকা ব্যাংকের একটি কাউন্টারও ইসলামী ব্যাংকিং করছে। তবে এগুলোর মধ্যে কোনো কোনো ব্যাংকের কিছু ত্রুটি আছে, পুরোপুরি ইসলামী নয়। তারা এ ত্রুটিগুলো কাটিয়ে উঠবেন বলে আশা রাখি। বিদেশী ব্যাংকগুলোর মধ্যে ফয়সল ইসলামী ব্যাংকেও ইসলামী ব্যাংকিং আছে।

ইসলামের আদর্শ হলো নম্র, ভদ্র এবং শালীনতার আদর্শ। সেটা ছিল আমাদের নবী করীম (স)-এর। এই আদর্শ দিয়ে আমাদেরকে জনগণের কাছে পৌছাতে হবে। এরপরও আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা মাত্র শুরু বলা যায়। তবুও এটা বর্তমানে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যার কারণে যদি একটি শক্তিশালী ইসলামী পার্টি হয় এবং ইসলামী লিডারশীপ হয় তবে এদেশকে বদলে দিতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কাজ এগিয়ে দিয়েছে বলা যায়। এখন শক্তিশালী একটা দল হলে এদেশকে বদলে দেয়া কঠিন হবে না। একটা ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি দাঁড়ানোর কাজ এই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার দ্বারা হয়েছে। এটা যে কত বড় একটা কাজ তা আমি ভাষায় বলতে পারবো না।

আসলে আগে আমাদের বুঝতে হবে যে, ব্যাংকিং কি? আগে ব্যাংকিং, তারপর ইসলামী ব্যাংকিং। আগে রাষ্ট্র, তারপর ইসলামী রাষ্ট্র। আগে মানুষ, তারপর ইসলামী মানুষ। এখন ব্যাংকিং না বুঝলে সমস্যা হবে। ব্যাংকস আর ডিলিং উইথ দ্য পিপল্স মানি- জনগণ কি চায়, এটা আপনাকে আরো জানতে হবে। আপনি ভালো ব্যবসা করবেন, সঠিক ব্যবসা করবেন এবং ইসলামী আদর্শ অনুসারে করবেন, করে যতটা প্রফিট সম্ভব করবেন। এটা জনগণের মতামত। এটা ইসলামবিরোধী নয়। সুতরাং, আপনাকে সমন্বয় করতে হবে প্রফিট এবং আদর্শের।

www.pathagar.com

বিশ্ব আর্থিক সংকট
অংশীদারিত্ব ব্যাংকিংই একমাত্র সমাধান

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এখন উল্লেখ করার মতো আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। এ সংকট ১৯৩০-এর দশকের মতো ব্যাংকগুলোকে অচল অথবা ব্যাংকিং খাতের ব্যর্থতাকে নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য করে না তুললেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন অর্থ সংকটে ভুগছে। এ ধরনের সংকট গত ৫০ বছরে কখনও দেখা যায়নি। আইএমএফ-এর সমীক্ষা অনুযায়ী আইএমএফ-এর সদস্য দেশসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের বেশী রাষ্ট্র উল্লেখ করার মতো আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। ব্যাংকিং খাতের সংকটের কারণে সৃষ্ট উচ্চমূল্য ও সামষ্টিক অর্থনীতির নানা প্রতিবন্ধকতা আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহের বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ হয়ে আছে।

সাম্প্রতিককালে এশিয়ার কিছু কিছু দেশ মারাত্মক মুদ্রা ও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। কয়েক দশকের সময়কার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পর এশীয় দেশগুলো এ ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয়। এ সংকটের পূর্ববর্তী ৩০ বছরের মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছে কোরিয়ায় ১০ গুণ, থাইল্যান্ডে ৫ গুণ এবং মালয়েশিয়ায় ৪ গুণ।

বর্তমান সংকটের পূর্ব পর্যন্ত উন্নয়নশীল বিশ্বের মূলধন প্রবাহের অর্ধেকই এসেছে এশিয়ায়। বিগত দশকে বিশ্ববাজারে এশিয়ার বিকাশমান ও উন্নয়নশীল বাজার অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণে উন্নীত হয়ে বিশ্ব রপ্তানির এক-পঞ্চমাংশে পৌছে। এ ধরনের প্রবৃদ্ধির রেকর্ড ও শক্তিশালী বাণিজ্য সাফল্যের নজীর অভূতপূর্ব এবং ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রশ্ন হলো, বহু বছরের অসাধারণ সাফল্যের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসব ঘটনা কিভাবে ঘটল? ভুলটি হয়েছিল কোথায়?

বহু দিক থেকে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও কোরিয়া প্রায় একই ধরনের সংকটের মোকাবিলা করছে। এসব দেশ আস্থার সংকটে ভুগছে এবং তাদের মুদ্রা ব্যাপক অবমূল্যায়নের শিকার। অধিকন্তু প্রতিটি দেশের দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ বেসরকারী খাতের অতিমাত্রায় বিদেশী ঋণগ্রহণ এবং স্বচ্ছতার অভাব সংকটের সৃষ্টি করেছে এবং তা নিরসনের প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলেছে।

(আইএমএফ সমীক্ষা, বিভিন্ন সংখ্যা)।

www.pathagar.com

১৯৯০-এর দশকে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ আর্থিক খাতের সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সংকটের বৈশিষ্ট্য ছিল অব্যাহতভাবে আমানত প্রত্যাহার, পুঁজি নিয়ে সরে পড়া এবং ব্যাংকিং খাতের ব্যর্থতা। ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে ভেনিজুয়েলার সংকট মুদ্রাস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধির ওপর সবচেয়ে বেশী নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বস্তুত সামষ্টিক ব্যবস্থাপনার ভারসাম্যহীনতা, অসম্পূর্ণ আর্থিক উদারীকরণ, ব্যাপক হারে আভ্যন্তরীণ ঋণগ্রহণ জালিয়াতিকে গোপন করে রাখার সুযোগ না পাবার মতো প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং তত্ত্বাবধানের অভাবে সম্মিলিত ফল হিসেবে আলোচ্য সংকটের সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিকে সূচিত আর্জেন্টিনার আর্থিক খাতের সংকটের সময় ব্যাপকাকারে পুঁজির বহির্গমন লক্ষ্য করা যায়। মেক্সিকান অবমূল্যায়নের প্রভাব, চলতি হিসেবের ঘাটতি, নিম্নপর্যায়ের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও অবনতিশীল রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সালে শুরু হওয়া প্যারাগুয়ের ব্যাংকিং সংকটের সৃষ্টি হয় প্রধানত পর্যাপ্ত ব্যাংক সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই আর্থিক উদারীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। এতে অপযার্প্ত পুঁজিসর্বস্ব একটি আর্থিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক মুদ্রা বিপর্যয়, পুঁজির প্রবাহ বর্ধিত এবং আর্থিক বাজারের ক্রমাগত বিশ্বায়নে উন্নয়নশীল দেশের বিশেষত বিকাশমান অর্থনীতির দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে উদারভাবে মুদ্রা ব্যবস্থাপনা সাজানোর উদ্যোগ প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়েছে।

আর্থিক সংকটের বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের দিক নির্দেশনা

পূর্ব এশিয়ার সাম্প্রতিক আর্থিক সংকটের কারণসমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সংকটের সমাধানের জন্য আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, সংকট নিরসনের জন্য দেয়া এসব পরামর্শ কতটুকু যথার্থ এবং তা কতটা ইসলামী নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অর্থনীতিবিদের প্রস্তাবিত সমাধান কতটা আমরা গ্রহণ করতে পারি? এসব সমাধান কি ইসলামী ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য এবং অর্থনীতির তত্ত্ব ও ধারণাসমূহ কি অপরিহার্যভাবে মূল্য নিরপেক্ষ? আর্থিক সংকট দূর করা বা তা প্রতিহত করার ব্যাপারে কি বিশেষ ইসলামী কৌশল ও কর্মসূচী রয়েছে?

১৯৯৭-৯৮-এর এশীয় আর্থিক সংকটকে সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অর্থনীতিবিদ, আইএমএফ কর্মকর্তা ও অন্যরা প্রধানত নিম্ন উল্লেখিত কারণগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে, এসব দেশের

www.pathagar.com

অধিকাংশতেই কৃত্রিম বিনিময় হার বজায় রাখার মাধ্যমে স্থানীয় মুদ্রাকে অতিমূল্যায়িত করে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সময়মত ও যথাযথভাবে মুদ্রার অবমূল্যায়ন অনুমোদন করেনি। এর ফলে অধিকাংশ দেশেই চলতি হিসাবের ঘাটতি স্ফীত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বিনিময় হারের পতন ঘটেছে। একই সময়ে মুদ্রার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের আন্দাজ-অনুমান ভবিষ্যত বাণীও আস্থায় চিড় ধরিয়েছে। এটি মুদ্রার বিনিময় হারকে দ্রুত নিচে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, এসব দেশ বিপুল অংকের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেছে, যার অধিকাংশ নেয়া হয়েছে বেসরকারী খাত থেকে। এসব ঋণের সিংহভাগ স্বল্প মেয়াদের জন্য গ্রহণ করে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করা হয়। আর্থিক সংকটের সামান্য আভাস পাবার পর বিদেশী পুঁজির ব্যাপক বহির্গমন শুরু হয়। যা থেকে বড় আকারের তারল্য সংকটের সূত্রপাত ঘটে। সংকট কবলিত দেশগুলোর মধ্যে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার উদ্ধার প্যাকেজ সহায়তা ছাড়া উক্ত ঋণ ফেরত দানেও অসমর্থ হয়ে পড়ে। বিদেশী পুঁজির আকস্মিক নির্গমনের ফলে স্থানীয় মুদ্রার মূল্যমান দ্রুত পড়ে যায়, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়, প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়, বেকারত্ব বাড়তে থাকে, আয় কমে যায়, সামাজিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, এমনকি কোথাও কোথাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যায়।

তৃতীয়ত, এসব দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রেও মারাত্মক সমস্যা ছিল। বিদেশ থেকে নেয়া তহবিলসহ বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয় মন্দ খাতে। এ কারণে এসব দেশ ১৯৯৭-৯৮ সালের সংকট দেখা দেয়ার আগে থেকেও মন্দ ঋণের সমস্যার সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও তত্ত্বাবধান এবং বিধিগত অনুশাসনমূলক দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। ফলে সংকটের সৃষ্টি হবার পর অধিকাংশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তা অথবা বিদেশ থেকে কোনো উদ্ধার প্যাকেজ ব্যতিরেকে তাদের বৈদেশিক দায় মেটাতে ব্যর্থ হয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আর্থিক সংকটের সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব করেছেন তার মূল বক্তব্য নিচে দেয়া হলো :

এক. যে সব দেশ মুক্তভাবে অথবা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে নমনীয় বিনিময় হার অনুসরণ করেছিল তা তাদের বজায় রাখা উচিত। আমার বিবেচনায়, এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত কার্যক্রম হবে। তা না হলে অতিমূল্যায়িত মুদ্রার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সামনেও অব্যাহত থাকবে।

দুই. বেসরকারী বিনিয়োগ প্রবাহকে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদী বেসরকারী পুঁজি অত্যন্ত সতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিত।

www.pathagar.com

প্রকৃত খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা দরকার। প্রয়োজনবোধে দেশে স্বল্পমেয়াদী পুঁজি প্রবাহের পর্যায় ও শর্তাবলী কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করতে পারে।

আমার বিবেচনায়, বেসরকারী পুঁজিপ্রবাহ বিশেষভাবে স্বল্পমেয়াদী বেসরকারী পুঁজিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদী বাজারে নানা সমস্যা দেখা যায়। এক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপেক্ষা করতে পারে না।

তিন. আর্থিক ব্যবস্থার সব ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমনভাবে ব্যাংকগুলোকে পরিচালনা করা উচিত যাতে মন্দ ঋণ সমস্যা ও তারল্য সংকটের কারণে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে- এমন মন্দ বিনিয়োগ কোনোভাবেই এসব ব্যাংক করতে না পারে। আর্থিক সংকটে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, একটি শক্তিশালী ও কার্যকর কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং গতিশীল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কত বেশী।

ভবিষ্যতে যে কোনো দেশ যাতে আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা পেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পর্কে উপরে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এসব সমাধানকে ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী সরকারও অন্যদের সাথে অনুসরণ করতে পারেন। বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে এসব কর্মসূচীকে সংযুক্ত করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধান, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম, বিনিময়নীতি হার প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী ইসলামী বা অ-ইসলামী শাসনে একই রকম থাকতে পারে। একই সাথে এটাও বলা যায় যে, অর্থনীতির অধিকাংশ তত্ত্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয় (কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে), অবশ্য ইসলামী অবকাঠামোতে ন্যায়বিচার ও নৈতিক মানদণ্ডসহ আরো কিছু বিষয় বিবেচনায় আনা হয়। অনেক কারণে উপরে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত আর্থিক সংকট থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়। ভালো ব্যবস্থাপনা ও যুক্তিযুক্ত তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করে 'ইকোনোমিস্ট' (লন্ডন) বলেছে :

পাশ্চাত্য আধুনিক যুগেও ইসলামের কাছ থেকে ইকুইটি ব্যাংকিং বা অংশীদারিত্বের ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিতে পারে। (দি ইকোনমিস্ট, আগস্ট ১৯৯৪, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)

www.pathagar.com

ব্যবস্থায় মন্দ বিনিয়োগের সম্ভাবনা অনেক হ্রাস পায়। এ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের ব্যাপারে, অনেক বেশী তত্ত্বাবধান করা হয় বলে যে কোনো ইকুইটি স্কীমে মন্দ ঋণের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। 'মুশারাকা' ব্যবস্থায় বিদেশী তহবিল নেয়া হলে এ ধরনের পুঁজির অসময়ে পালিয়ে যাওয়া বা প্রত্যাহার করে নেয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী ব্যবস্থায় ধারণা-অনুমানের আচরণ (Speculation) অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইসলাম জুয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামে অনুমান-নির্ভর ব্যবস্থাকে দারুণভাবে অপছন্দ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এটি সত্য যে, অনেক সময় স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও অনুমানের মধ্যে পার্থক্য করে অনুমানকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবুও ইসলামী ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক কর্তৃপক্ষ অনুমানভিত্তিক তৎপরতার (শেয়ার বাজার অথবা মুদ্রা বাজার অথবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন) উপর ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ অথবা দিক-নির্দেশনা জারি করতে পারে। যদি সবকিছুকে মুক্ত রাখার পক্ষপাতি একশ্রেণীর অর্থনীতিবিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও অর্থনীতির স্বার্থে প্রয়োজন হয় অথবা জনগণ চায় তাহলে এ পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থনীতির আকস্মিক পরিবর্তনশীলতা ইসলামী অর্থনীতিতে কম দেখা যায়। এটা স্বীকৃত যে, ভালো ব্যবস্থাপনার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আর্থিক সংকট থেকে রেহাই পাবার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থার যে সুবিধা তা অন্য কোনোভাবে পাওয়ার সুযোগ নেই।

www.pathagar.com

আল-কুরআনে অর্থনীতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমানতের খেয়ানত প্রসঙ্গে

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖ إِلَيْكَ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ * بَلٰى مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ *

কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দেবে, আবার এমন লোকও আছে, যার কাছে একটি দীনারও আমানত রাখলে তার পেছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দেবে না, এটা এই কারণে যে, তারা বলে নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোনো বাধ্য বাধকতা নেই এবং তারা জেনে শুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। হ্যাঁ, কেউ তার অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং সাবধান হয়ে চললে আল্লাহ মুত্তাকীকে ভালোবাসেন। (সূরা আল-ইমরান : ৭৫-৭৬)

ভূমিকা

সূরা আল-ইমরানের ৭৫ নং আয়াতে তৎকালীন ইয়াহুদীদের নৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক মানসিকতা ও স্বার্থপরতার কথা বলা হয়েছে। যদিও তাদের মধ্যেও ভালো লোক ছিল, কিন্তু আয়াতে যেভাবে তাদের মানসিকতার উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তাদের অধিকাংশই ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর এবং আমানতের খেয়ানতকারী। এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষিতে আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা যামাখশারী তার *তাফসীরে কাশ্‌শাফে* ও আল্লামা আলূসী তার *তাফসীর রূহুল মা'আনী*তে আমানতের খেয়ানতের ব্যাপারে তৎকালীন ইয়াহুদীদের নীচ আচরণের কথা উল্লেখ করেছেন।

উম্মী শব্দের অর্থ

আয়াতে ব্যবহৃত 'উম্মী' শব্দের অর্থ যদিও নিরক্ষর তথাপি পরিভাষার দিক থেকে এ শব্দটি ইয়াহূদী ব্যতীত অন্য সবার জন্য ইয়াহুদীরা ব্যবহার করত। অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে বনী ইসরাঈলরা ইয়াহুদীদের জন্য আইন এবং অন্যদের জন্য আইন প্রয়োগ করত *(দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৪ নং টীকা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা)*। এই বৈষম্যমূলক আচরণকে তারা সঠিক মনে করত বলেই তারা নিজেদের মধ্যে রক্ষিত আমানতকে আদায় করত এবং অন্যদের রাখা

www.pathagar.com

আমানতকে তারা আদায় করত না। এ বৈষম্যমূলক আচরণকে তারা তাদের শরীয়ত মেতাবেক বৈধ মনে করত- যেমন আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ অথবা আমানতের খেয়ানত আল্লাহ কখনো করতে বলেননি। এ ব্যাপারে তারা যা বলে তা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ মাত্র। ৭৫ নং আয়াতে ইয়াহুদীদের খেয়ানতের মানসিকতা উল্লেখ করার পর আল্লাহ পাক ৭৬ নং আয়াতে আমানতদারী ও তাকওয়া গ্রহণ পর্যায়ে একটি সাধারণ তাৎপর্যবোধক ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলছেন- যে কেউ অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলবে তাকে আল্লাহ ভালোবাসেন। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, অঙ্গীকার রক্ষা করা (যার মধ্যে আমানত রক্ষা করা, খেয়ানত না করাও শামিল) আল্লাহ পছন্দ করেন। এখানে আল্লাহ কেবল অঙ্গীকার পূরণ করতে, চুক্তি রক্ষা করতে উৎসাহিত করছেন। একই বিষয়কে আল্লাহ পাক সূরা মায়িদাতে ফরয ঘোষণা করছেন এ ভাষায় : হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের চুক্তিসমূহ মেনে চল। (সূরা মায়িদা : ১)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সূরা মায়িদার এ আয়াত আলোচনার সময় চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ও এসবের সঙ্গে সম্পাদিত আইন-কানুন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এ কথা বলাই যথেষ্ট হবে যে, অঙ্গীকার পূরণ করাকে ইসলাম অত্যন্ত জরুরী মনে করে। সব ধরনের অঙ্গীকার রক্ষা করার উপর সমাজ ও অর্থনীতির সুস্থতা ও ভারসাম্য নির্ভর করে। অঙ্গীকার রক্ষা না হলে সমাজ ও অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রে ও অর্থনীতিতে স্বাধীন ইচ্ছায় এবং শরীয়তসম্মত যে সব অঙ্গীকার করা হবে, তা রক্ষা করতে সবাইকে বাধ্য করা হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের আইন- আদালতের তা অন্যতম দায়িত্ব হবে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, ৭৬ নং আয়াতের লক্ষ্য কেবল ইয়াহুদীরা নয় বরং সকল মানুষ এ আয়াতে সাধারণ তাৎপর্য বোধক বা 'আম' পর্যায়ের। আল্লামা যামাখ্শারীও আয়াতটিকে 'আম' বলেছেন। আয়াতের মধ্যকার শব্দের বিচারেও তা স্পষ্ট। কাজেই আয়াতের নির্দেশ সবার প্রতি প্রযোজ্য। মুসলমানদেরকে তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং জীবন ও সমাজে এ নির্দেশকে কার্যকর করতে হবে।

www.pathagar.com

পরিবারের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গে

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا *

নারীদের ওপর তাদের নিরাপত্তা এবং ভরণপোষণের সুব্যবস্থাপনার ব্যাপারে পুরুষের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য রয়েছে, কারণ আল্লাহ্ পুরুষদের নারীদের চাইতে অধিক (ক্ষমতা) দিয়েছেন এ জন্য যে, পুরুষ তাদের ভরণপোষণের জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা স্বামীদের আনুগত্য এবং স্বামীদের অনুপস্থিতে ও আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারে গোপনীয়তাকে তারা হেফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতা ও খারাপ ব্যবহার আশংকা করো তাদের প্রথমে শাসন করো, এরপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং সবশেষে তাদের (মৃদু) প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের আনুগত্যে ফিরে আসে তবে তাদের বিরুদ্ধে বিপত্তিকর কোনো পথ অন্বেষণ করো না। আল্লাহ্ অতিমহান (সর্বোচ্চ) ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

(সূরা আন-নিসা : ৩৪)

তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ সম্পর্কে তাফসীরকারদের অভিমত

قوم শব্দটি এ আয়াতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। 'ক্বাওয়্যাম' সেই লোককে বলা হয়, যে কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থাপনার যাবতীয় ব্যাপারে সঠিক ও সুষ্ঠু অবস্থায় চালনা করার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারী করার এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দায়িত্বশীল হয়ে থাকে।[১]

قوامون-এর মূল শব্দ قوم যা থেকে مصدر مضارع ও اسم فاعل ماضى-এর রূপ এই : قام يقوم قياما فهو قائم -এর বহু বচন বলা হয় তাকে ওপরে দাঁড় করালো, সঠিক করে দিল বা প্রতিষ্ঠা করে দিল; সে ঘরে যথানিয়মে বসবাস বা অবস্থান করলো।

قيام শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা قيام بالشخص اما يستخيرا واختيارا ব্যক্তির দাঁড়ানো- এ আবার অপরের দ্বারা বশীভূত বা বাধ্য হয়ে দাঁড়ানো কিংবা স্বেচ্ছায় ঐচ্ছিকভাবে দাঁড়ানো وقيام للشئ هو المواعناة للشئ والحفظه

www.pathagar.com

কোনো বস্তুর জন্য দাঁড়ানো; এর অর্থ বস্তুটিকে দেখাশোনা ও হেফাজত করা وقيام على العزم على الشئ সংকল্প নিয়ে কোনো বস্তুর ওপর দাঁড়ানো, এর অর্থ বস্তুটিকে প্রতিষ্ঠা বা প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো। অপরের দ্বারা বাধ্য ও বশীভূত হয়ে দাঁড়ানোর উদাহরণ কুরআন থেকে منها قائم و حصيد - এই তো তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ী, যেগুলোর কতক দাঁড়িয়ে আছে, আর কতক ধ্বংস হয়ে গেছে। স্বেচ্ছায় স্বতপ্রণোদিত ও স্বাধীনভাবে দাঁড়ানোর উদাহরণ امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما -তারা অনুগত হয়ে রাতের মুহূর্তগুলো সিজদায় ও দাঁড়ানো অবস্থায় কাটিয়ে থাকে الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم বুদ্ধিমান লোকেরা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকে। الرجال قوامون على النساء পুরুষরা নারীদের ওপর স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে ইখতিয়ার নিয়ে قائم বা দাঁড়ানো রয়েছে। الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما তারা প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদায় ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত যাপন করে। শেষোক্ত আয়াত দু'টিতে قيام শব্দ قائم - এর বহু বচন।

কিয়াম শব্দ দেখাশুনা ও হেফাজত করা অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كونوا قوامون الله- قائم بالقسط তবে- الا مادمت عليه قائما এখানে (পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে) সর্বদা লেগে থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

আয়াতের সাধারণ তাৎপর্য : মুফাস্‌সিরদের আলোচনা

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (র) লিখেছেন : এ আয়াত দাম্পত্য জীবন সংগঠন ব্যাপারে এবং যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার জন্য আবশ্যক আর যেসব কাজ তার পথে বাধার সৃষ্টি করে, সে সব বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করেছে। এ পর্যায়েই আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে পরিবারের পরিচালকের ভূমিকা দান করেছেন। এ কথা স্বীকৃত যে, পুরুষ ও নারী আল্লাহর সৃষ্টি এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিতে কারো উপর জুলুম করেননি। তিনি প্রত্যেককে বিশেষ বিশেষ কাজের ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সে জন্য তাকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও পারদর্শিতা দিয়েছেন। নারীদের কতগুলো স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। এগুলো তার বিনয়, নম্রতা, কাজে ক্ষিপ্রতা এবং সন্তানের যে কোনো প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সাড়া দেয়া। অনুরূপভাবে পুরুষকে কতকগুলো স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে জন্যই শারীরিক গঠনের কাঠামো, মেজাজের স্থিরতা, শক্তি, দূরদর্শিতা ইত্যাদিতে

www.pathagar.com

তার বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। এ সব বৈশিষ্ট্যই পুরুষকে পরিবারের ব্যবস্থাপনার যোগ্য করেছে। অনুরূপ স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণও পুরুষের নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী গুণ।

নারী ও পুরুষের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, কে শ্রেষ্ঠ, কে হেয়- এটা নির্ণয় করা একটি কঠিন প্রশ্ন। এটা এমন জটিল ব্যাপার, যার সমাধান মানব বুদ্ধি-বিবেকের পক্ষে কষ্টকর। এতদসত্ত্বেও নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য বজায় রেখে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মানুষের ফিতরত বা সৃষ্টিগত স্বভাবই এর সমাধান। ইসলামে এই ফিতরতের গুরুত্ব অপরিসীম। আয়াতে নেক্‌কার মু'মিনা নারীদের অনুগতা বলা হয়েছে। তার আনুগত্য হবে স্বতঃস্ফূর্ত, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও আন্তরিকতাপূর্ণ, যাতে কোনো চাপ বা প্রভাব থাকবে না। এ জন্যই আয়াতে طائعات না বলে قانتات বলা হয়েছে।[৩]

অবাধ্য নারীদের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (র) লিখেছেন : "প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা লাঞ্ছনার উদ্দেশ্যে নয় বরং সংশোধনের লক্ষ্যে এ সব পদক্ষেপ অবলম্বন করতে হবে। প্রথমে উপদেশ দিতে হবে। উপদেশ প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করতে হবে। শয্যা ত্যাগের ব্যাপারে দেখতে হবে যেন স্বামী-স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট নিভৃত ঘর ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় না ঘটে, যেন এটা ছেলেমেয়েদের সামনে না হয়, যার ফলে তাদের মন-মানসিকতা বিনষ্ট বা বিপর্যয়গ্রস্ত হয়ে না পড়ে।" মারাত্মক পর্যায়ে নবী করিম (স) হতে বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে :

'তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে মেরো না।[৪]'

'যারা মারধোর কর, তারা তোমাদের মধ্যে ভাল লোক নয়।[৫]'

এ আয়াতের উপর মাওলানা মওদূদী লিখেছেন : 'এখানে বিশিষ্টতা অর্থ মর্যাদা, সম্মান বা ইজ্জত নয়- যেমন সাধারণ লোকদের ধারণা। এখানে এ শব্দের অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে এক পক্ষকে অর্থাৎ পুরুষদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা অপর পক্ষদের স্ত্রীদের দেয়া হয়নি কিংবা অপেক্ষাকৃত কম দেয়া হয়েছে।[৬]'

পুরুষদের قوام হওয়া এবং অবাধ্য নারীদের শাস্তিদান প্রসঙ্গে প্রাচীন তাফসীর- কারগণ মোটামুটি একই ধরনের আলোচনা করেছেন।[৭]

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

মুসলিম সমাজ সংগঠন পর্যায়ে একটি দিক হলো পরিবারকে উপযোগিভাবে বিবর্তিত করা। সূরা নিসার ১৫ নং আয়াত থেকে শুরু করে ৪২ নং আয়াত পর্যন্ত

www.pathagar.com

সে দিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। তাকে আলোচনাধীন ৩৪ নং আয়াতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বলে গণ্য করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে রয়েছে সমাজে নারীর বিশিষ্ট ধরনের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পরিবারের কাঠামোতে নির্দেশাবলী।

মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের প্রধান স্তম্ভই হলো মু'মিন মুসলিম নর-নারী নিয়ে সংগঠিত পরিবার একক। এই একক রাষ্ট্র পরিচালনা সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং ভারসাম্য রক্ষার ভিত্তি। সে কারণেই ইসলামী সমাজ দর্শনে এই এককের স্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার যদি আদর্শগতভাবে সুসংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়, তারই স্বাভাবিক পরিণতিতে গোটা সমাজ ও অর্থনীতির পক্ষে সমৃদ্ধ ও সুসমন্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বর্তমান আয়াতের তাৎপর্যকে সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রথমত, পরিবারের সদস্য হলো স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং একান্নভুক্ত পরিবারে পুত্রের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা। এ সকল সদস্য নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয় একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান প্রধানত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সম্পর্ক এবং মূল্যবোধে নির্মিত। মুসলিম রাষ্ট্রের অধীনে উক্ত সম্পর্ক ও মূল্যবোধ ইসলামী নীতিমালাপ্রসূত। এখানে পরিবারের কর্ণধার হিসেবে একজনকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয়। ইসলামী নীতি পুরুষকে পরিবারপ্রধানের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করেছে।

ক. পরিবারের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা আসলে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার সাহায্যে সাফল্য অর্জনের কঠিন দায়িত্ব। সাধারণত দেখা যায় নারীর চেয়ে পুরুষই দায়িত্ব পালনে তুলনামূলকভাবে যোগ্যতর। সুতরাং ইসলামী নীতি পুরুষ স্বামীকে পরিবারের কর্তা বা নেতৃত্বের দায়িত্ব দান করেছে। এটি সাধারণ নীতি। স্থানবিশেষে তার ব্যতিক্রম থাকাও বিচিত্র নয়। সে ব্যতিক্রম স্বাভাবিক যোগ্যতার মাপকাঠি প্রয়োগের ভিত্তিতেই যুক্তি লাভ করবে।

খ. পরিবারের শান্তি-শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য একজন দায়িত্বশীল ও পরিচালক বা পরিবারপ্রধান প্রয়োজন, তা না হলে অশান্তি, বিশৃংখলা ও স্থিতিহীনতা পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। ইসলাম সে দায়িত্ব পুরুষ বা স্বামীকে দিয়েছে। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে মাতৃপ্রধান ও পিতৃপ্রধান পরিবার এবং গোষ্ঠীর উৎপত্তি আর পরিণতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পুরুষপ্রধান পরিবারের ব্যবস্থায়ই শৃংখলা, স্থিতিশীলতা ও কল্যাণ বিরাজ করেছে। খুব কম ক্ষেত্রেই মাতৃপ্রধান পরিবার গোষ্ঠি একটি সর্বময় কল্যাণকর সমাজ গঠনে সক্ষম হয়েছে।

গ. পরিবার সংগঠনে ইসলামী নীতি স্বামীকে/পুরুষকে নেতৃত্ব দান করেছে, যাতে স্বামী/পুরুষ পরিবারের সকল সদস্যের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের

www.pathagar.com

উপযোগী সম্পদের আয়-উপার্জন ক্ষেত্রে এবং পরিবারের সাধারণ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। তারই নীতি হলো : স্ত্রী-নারী পরিবারের সব রকম অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পারিবারিক ব্যবস্থাপনা (Home management) পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। দু'জনের একজনকে ঘরের ও বাইরের সকল রকম দায়িত্ব পালন দক্ষতা বা কর্মকুশলতার (Efficiency) সঙ্গে সম্ভব নয়। আর নারীকে বাইরের জগতের জীবন যুদ্ধের কঠোরতার মোকাবিলা করতে সব ক্ষেত্রেই ঠেলে দেয়া স্বাভাবিক হবে না, কর্মকুশলতাপূর্ণও (Efficient) হবে না। তাতে অন্য একটি বিষয় সাংঘাতিকভাবে উপেক্ষিত হবার আশংকা দেখা দেয়। তা হচ্ছে সন্তানদের যথার্থ লালন-পালন ও তাদের সত্যিকার আদর-যত্ন ও স্নেহ-প্রীতির মধ্যে গড়ে ওঠার অধিকার। এ রকম হওয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য অকল্যাণকর। এ জন্যই ইসলাম নারীকে সাধারণ অবস্থায় অত্যন্ত জরুরী ও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাইরের কাজ করার দায়িত্ব দেয় না। কেবল সত্যিকার প্রয়োজনেই তা করা বাঞ্ছনীয়। নারীর শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দরুন নারীকে বাইরের সকল কাজে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে সুচারুরূপে ও দক্ষতার সাথে করতে দিলেও সে অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্পন্ন করতে পারবে না নিজের পরিবারের ও সমাজের ক্ষতি না করে। অমুসলিম উন্নত বহু দেশেই নারীকে কতিপয় কাজে নিয়োগদান আইনত নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মু'মিন স্বামীর নেতৃত্বকে মু'মিনা স্ত্রী সাদরে গ্রহণ করে ইসলামী নীতির অধীনে। কারণ পরিবারস্থ সকলের জন্য অর্থনৈতিক আয়-উপার্জনের জন্য তাকে আর দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না। পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ও দেশ জাতির জন্য সুযোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করার অমূল্য দায়িত্ব পালনেই তিনি আত্মনিবেশ করেছেন। আর সৃষ্টির এই রহস্যই যে, এ দায়িত্ব পালনেই নারী জাতির আপেক্ষিক সুবিধা (Comparative advantage) নিহিত।

তৃতীয়ত, স্ত্রীকে ভুল-ভ্রান্তি থেকেও রক্ষা করা বা সংশোধিত আচরণে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও ক্বাওয়াম বা সংরক্ষণকারী হওয়ার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সে দায়িত্ব পালনে চারটি পদক্ষেপ গ্রহণের উল্লেখ করা হয়েছে :

১. আলোচনা ও উপদেশের মাধ্যমে ভুল সংশোধন করা এবং তাতে সংশোধন না হলে

২. যৌন সম্পর্ক স্থগিত রাখা; তাতেও যদি সংশোধন না হয়, তাহলে

৩. মৃদু প্রহার (প্রতীক বিরক্তি প্রদর্শন হিসাবে) করা, এবং শেষোক্ত চরম পদক্ষেপও ফলপ্রসূ না হলে

www.pathagar.com

৪. স্বামী-পক্ষের ও স্ত্রী-পক্ষের দুই পরিবারের প্রতিনিধিদের সালিসী ব্যবস্থা করা। এ সকল প্রচেষ্টায় স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি ও ভ্রান্ত আচরণ সংশোধন সম্ভব হয়ে গেলে পরিবারের সুখ-শান্তি অটুট রাখার জন্য স্বামী তাকে সাদরে অভিনন্দন জানাবেন। এভাবে পরিবার ভাঙনের আশংকাকে অতিক্রম করবে। আর যে ক্ষেত্রে ভাঙন অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে, সে রকম ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদেরও সুবিচারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণনীতি রয়েছে। উপরোক্তভাবে ইসলামী নীতির অনুসরণ পরিবারের সংহতি রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং তারই মাধ্যমে সুস্থ সমাজ ও অর্থনীতির সংগঠনকে সংরক্ষণ করা যায়। পরিবারের সুশৃঙ্খল আচরণ সমাজকে মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকে রক্ষা করবে, অর্থনীতিকেও পথচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে। সে কাঠামোতে বাঞ্ছনীয় পদ্ধতিতে ও ক্ষেত্রবিশেষ শুধু পুরুষ ও নারী উভয়েরই আয়- উপার্জনের এবং তা ভোগ করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. তাফহীমুল কুরআন, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, ২য় খণ্ড, সূরা নিসার ৩৪ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

২. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত।

৩. ফী-যিলালিল কুরআন, ২য় খণ্ড, ৮ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬৪৮-৬৫৬।

৪. আবূ দাউদ, ইবন মাজা।

৫. আবূ দাউদ, ইবন মাজা।

৬. তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসার ৫৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৭. কাশ্‌শাফ, বায়যাভী, রূহুল মা'আনী, তাফসীরে কবীর, সূরা নিসার তাফসীর অংশ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

ইয়াতীম ও নারীদের সমস্যা এবং অধিকার সম্পর্কে

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا * وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ط وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا *

এবং লোকেরা তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বল, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন এবং (সে সঙ্গে সে হুকুমগুলোও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন) এই কিতাবে বর্ণিত যে ইয়াতীম মেয়েদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, তাদের বিবাহ করতে তোমরা আগ্রহ পোষণ কর না এবং (সেই হুকুমগুলোও) যা অসহায়-অক্ষম শিশুদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। তোমরা ইয়াতীমদের প্রতি ন্যায় বিচার করবে। তোমরা যে কল্যাণকর কাজ করবে, তা আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। কোনো নারী যদি তার স্বামীর দিক থেকে নিষ্ঠুর ব্যবহার কিংবা তাকে পরিত্যাগের আশংকা করে, তখন স্বামী-স্ত্রী যদি তাদের মধ্যে পারস্পরিক আপোষে মিটমাট করে তবে তাতে দোষ নেই। এরূপ মীমাংসাই উত্তম। যদিও মানুষের মন লালসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু তোমরা যদি ইহ্সান অবলম্বন কর ও আত্মসংযমী হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কর্মনীতি সম্পর্কে অবহিত আছেন। (সূরা আন-নিসা : ১২৭-২৮)

প্রেক্ষিত

সূরা নিসায় ব্যাপকভাবে পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, নারী ও ইয়াতীমদের অধিকার ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াত দু'টিতেও ইয়াতীম ও নারীদের সমস্যা, তাদের অধিকার ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লামা আলূসী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'মীরাসের আয়াত নাযিল হলে বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। কেননা এটা তাদের কঠিন মনে হলো। তারা প্রশ্ন করতে লাগলো, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে অক্ষম-অযোগ্য কম বয়সী ছেলেরাও কি ওয়ারিস হবে? কম বয়সী মেয়েরাও কি উত্তরাধিকার পাবে? আসলে তারা আশা করছিল যে, এ ব্যাপারে আসমান থেকে কোনো সংশোধনী আসবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে করতে তারা দেখল যে, কোনো ওহী আর এলো না। তখন তারা ভাবলো, এ বিষয়ে যা হবার তা হয়েই গেছে তবে তো

www.pathagar.com

মীরাস সংক্রান্ত হুকুম মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তারা বলাবলি করলো, চল রাসূলুল্লাহ (স)-কে আবার প্রশ্ন করা যাক। এ প্রস্তাব অনুসারে তাঁকে তারা পুনরায় প্রশ্ন করায় এ (১২৭ নং) আয়াত নাযিল হয়।[১]

সাধারণ তাৎপর্য

আয়াতদ্বয়ে নারীদের অধিকার সম্পর্কে যে সব বিধান ও নির্দেশ এ সূরার শুরুতে দেয়া হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের সম্পত্তি ও অন্যান্য অধিকারের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। ইয়াতীম ও নারীদের আর্থ-সামাজিক অধিকারের বেশ কিছু আলোচনা সূরা নিসার পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে বলা হয়েছে। ১২৮ নং আয়াতে নতুন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে তালাক ও বিচ্ছেদের পরিবর্তে পারস্পরিক অধিকারের কিছু কম বেশীর ভিত্তিতে মীমাংসা করে নেয়াকে উত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মানসিক সংকীর্ণতাকে নিন্দা করা হয়েছে। স্ত্রীর সদ্ব্যবহার বা ইহসানকে উৎসাহিত করা হয়েছে।[২]

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

পারিবারিক সংগঠন ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য পারিবারিক শান্তি রক্ষা সংক্রান্ত বিস্তৃত বিধি-বিধান ইসলাম দিয়েছে। এর বিরাট অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। মজবুত পারিবারিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত কল্যাণকর। এর মাধ্যমে কেবল সামাজিক শান্তিই রক্ষা পায় না, অনেক অসহায় লোকেরও ব্যবস্থা হয়। যে সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থা শক্তিশালী, সেখানে দুস্থ লোকের দায়-দায়িত্ব সরকার ও সামজকে কম বহন করতে হবে। ১২৮ নং আয়াতে উল্লিখিত তালাকের পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আপোষ-মীমাংসার বিধান এ জন্যই দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে ১২৭ নং আয়াতে ইয়াতীম শিশুদের কথা ও ইয়াতীম মেয়েদের কথা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করে তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়া, তাদের সম্পত্তি তাদের প্রত্যর্পণ করা, তাদের অন্যান্য দান পাওয়ার (যেসব বিষয় সূরা নিসার প্রথম দু'রুকূতে আলোচিত হয়েছে) অধিকারের কথা জোরের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্র সরকার ও সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে- এসব বিষয়কে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুদের সব অধিকার সংরক্ষণ করা।

গ্রন্থপঞ্জী

১. তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬১; সূরা আন-নিসার ১২৭-১২৮ নং আয়াতের তাফসীর
২. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন-নিসার ১২৭-১২৮ নং আয়াত-এর তাফসীরের সারাংশ।

www.pathagar.com

কালালা'র সম্পত্তি বণ্টন প্রসঙ্গে

يَسْتَفْتُونَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗ
اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ *

লোকেরা তোমার নিকট কালালা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে জানতে চায়। বল, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কালালা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। কোনো ব্যক্তি যদি সন্তানহীন অবস্থায় মরে যায় এবং তার একজন বোন থাকে তবে সে (বোন) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধেক পাবে এবং বোন যদি সন্তানহীনা অবস্থায় মারা যায় তবে ভাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দু'বোন হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই বোন কয়েকজন হয়, তবে পুরুষের অংশ নারীর দ্বিগুণ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য আইন-কানুন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশংকায়। আল্লাহ সবকিছু জ্ঞাত ও অবহিত। (সূরা আন-নিসা : ১৭৬)

ভূমিকা

আয়াতটি সূরা নিসার অন্যান্য আয়াত নাযিলের বহু পরে নাযিল হয়েছে। হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনা হতে মনে করা যায় যে, এ আয়াত কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। এ বর্ণনা সহীহ্ প্রমাণিত না হলেও বস্তুত পক্ষে এতটুকু প্রমাণিত যে, এ আয়াত নবম হিজরীতে নাযিল হয়েছিল। সূরা নিসা পূর্ব হতেই একটি সম্পূর্ণ সূরা হিসেবে পঠিত হয়ে আসছিল। এ কারণে সূরার শুরুতে মীরাস সংক্রান্ত আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতার সঙ্গে এ আয়াতকে শামিল করা হয়নি, বরং সূরার শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে রাখা হয়েছে।[১]

গুরুত্বপূর্ণ শব্দ 'কালালা' সম্পর্কে আলোচনা

'কালালা' كلالة শব্দের অর্থ কি, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো কারো মতে, 'কালালা' সে ব্যক্তি যার কোনো সন্তান নেই এবং বাপ-দাদাও জীবিত নেই। কারো কারো মতে, 'কালালা' সেই ব্যক্তি যে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছে। সাধারণ ফিক্হবিদগণ এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা)-এর মতকে সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, 'কালালা' হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার কোনো সন্তান নেই এবং

www.pathagar.com

বাপ-দাদাও জীবিত নেই। কুরআন হতেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা কুরআনে 'কালালা'র বোনকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের অধিকারিণী করা হয়েছে অথচ কারো পিতা জীবিত থাকলে সে বোন কোনো কিছুই পায় না।[২]

আয়াতের আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সূরা নিসার ১১ ও ১২ আয়াতে মীরাসের বিস্তারিত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে।

এ আয়াত প্রসঙ্গে ফিক্‌হবিদগণ একমত হয়েছেন যে, এখানে সে সব ভাই-বোনের মীরাসের কথা বলা হয়েছে যারা মা-বাপ উভয় দিক বা বাপের দিক দিয়ে ভাই-বোন। এর অর্থ হলো যে, সূরা নিসার দ্বিতীয় রুকূতে যে ভাই-বোনের মীরাসের উল্লেখ করা হয়েছে তারা হচ্ছেন কেবল মায়ের দিক দিয়ে ভাই বা বোন।

মীরাসী আইন ইসলামী বিধানের একটি মূল অংশ। এটি ইসলামী অর্থনীতির বন্টন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত রাখাই সঙ্গত হবে। ইসলাম ব্যাপক বন্টনকে সমর্থন করেছে। মৃতের সম্পত্তির ব্যাপক বন্টন হিংসা, বিদ্বেষ ও বঞ্চনার মনোভাব দূর করতে সাহায্য করে এবং তা সামাজিক সৌহার্দ্যের ও শান্তির সহায়ক। ব্যাপক বন্টন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কল্যাণকর। মীরাসী আইনের মাধ্যমে অনেক দরিদ্র আত্মীয়ের পুনর্বাসন হয়ে থাকে। যে সমাজে মীরাসী আইন যথাযথভাবে কার্যকর হবে, যে সমাজে সংশ্লিষ্ট লোকদের পুনর্বাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান অনেক সহজতর হয়ে আসে আর এরা সরকারের উপরও এ ক্ষেত্রে তেমন একটা বোঝা বলে প্রতীয়মান হয় না। সম্পদ সীমিত সংখ্যক উত্তরাধিকারীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকে না কিছু সংখ্যককে বঞ্চিত করে।

এর ফলে সমাজের অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই সুদৃঢ় ও স্থিতিশীল হয়। অন্যদিকে ব্যাপকভাবে সম্পদ বন্টনের ফলে সমাজে ব্যক্তিগত পর্যায়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই পুঁজিহীন মানুষের সংখ্যা কম থাকে। তাতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে একটা সুস্থ ও প্রগতিশীল ধারা প্রবাহিত থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. তাফহীমুল কুরআন, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা অংশ দ্রষ্টব্য।

২. তাফহীমুল কুরআন, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ *

আর পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও তামাশার ব্যাপার ব্যতীত কিছুই নয়। যাঁরা তাকওয়া অবলম্বনকরে তাঁদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি অনুধাবন কর না? (সূরা আল-আন'আম : ৩২)

শব্দের আলোচনা

لعب ও لهو শব্দ দু'টি সমার্থক, কেননা উভয়ই বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে অবান্তর কাজে উৎসাহ দান করে এবং হালাল হারাম নির্বিশেষে অযথা চিত্তবিনোদন বা আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত করে।[১]

لعب খেলাধুলা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন يلعب فلان অর্থ অমুক ব্যক্তি খেলছে। لهو বলতে ঐ বস্তুকে বোঝায় যা মানুষকে কষ্টের কাজে লিপ্ত করে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে।[২]

মুফাস্‌সিরদের মতামত

ক. আল্লামা আলূসী (র) লিখেছেন, পূর্বের আয়াতে এ পার্থিব জীবনের পেছনে বিপদসংকুল আর একটি জীবন আছে তা বলার পর এ উভয় জীবনের মধ্যে মূলত কি পার্থক্য আছে এ আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কতটুকু পার্থিব উদ্দেশ্যে, পার্থিব জীবনের কাজ এবং ফলাফল ক্ষণস্থায়ী হওয়ার দৃষ্টিতে ক্রীড়া-কৌতুকের সমতুল্য ছাড়া কিছু নয়। এ প্রেক্ষিতে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে ইবাদত, নেক আমল ও জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজকর্ম ও শ্রম একথার আওতা বহির্ভূত হয়ে যাবে।[৩]

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (র) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, আয়াতের বক্তব্য একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য; কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে জীবনের সংগঠন সহজসাধ্য নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই। ইসলামী ধ্যান-ধারণা জীবনের যে জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি পেশ করে তাতে পার্থিব জীবনের কোনো অংশ তুচ্ছ ও অবহেলিত হবে না এবং প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই বর্জন করা হবে না। এ ব্যাপারে সাহাবীদের জীবনকে আদর্শ মনে করতে হবে। সম্পূর্ণ জীবন সম্পর্কে এরূপ ধারণার অবস্থান

www.pathagar.com

লালন ও বাস্তবায়ন তাঁদেরকে সফল করেছিল ইহলোকের জীবনেও এবং পরলোকের জীবনেও। তাঁরা দুনিয়ায় দাস হয়ে বাস করেননি। দুনিয়ার উপর তাঁরা আরোহণ করেছিলেন, দুনিয়া তাঁদের উপর আরোহণ করেনি।[৪]

ইমাম ফখরুদ্দীন আর রাযী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এখানে لعب অর্থ মুশরিক ও কাফিরদের জীবন, কারণ মু'মিনের জীবন নেক আমলসম্বলিত বিধায় তা ক্রীড়া-কৌতুকতুল্য হতে পারে না।[৫]

সামাজিক তাৎপর্য

ইহকালীন জীবনে মুসলিম জাতির দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে- এ আয়াত থেকে তার স্পষ্ট দিগ-দর্শন পাওয়া যায়। এ জীবন পরকালীন জীবনের তুলনায় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। জীবনের স্বার্থের জন্য কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা সমাজ পরকালীন জীবনের কল্যাণকে পরিত্যাগ করতে পারে না।

কুরআনের প্রায় প্রতি সূরাতেই এ ধরনের আয়াত রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ হচ্ছে ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের বৈষয়িক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হতে হবে। যদি তা হয়, তাহলে একজন মুসলিম এ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহের জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগ করবে না এবং সে জন্য কোনো বাতিল পন্থা বা উপায় অবলম্বন করবে না। মুসলমানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেও এ নীতি অবলম্বিত হবে। এ নীতির প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার, সাম্য, ত্যাগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

কেননা, পরকালের প্রাধান্য বর্জন ভিত্তিক দর্শন জুলুম, অত্যাচার, অবিচার ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে ব্যক্তিকে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির কারাগার থেকে মুক্ত করে এবং সমাজকে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিত আর্থ-সামাজিক জীবনের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। বর্তমানে তা যে হচ্ছে না, তার কারণ সমাজে ইসলামী শিক্ষা সঠিকভাবে প্রসার লাভ করেনি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তার কোনো প্রতিফলন নেই। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনেও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত হয়নি।

এ শিক্ষা এবং আদর্শ বাস্তবায়িত হলে সমাজ ও রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা কায়েম করবে, যাতে কোনোরূপ শোষণ ও জুলুমের মাধ্যমে কেউ ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহ করতে না পারে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় এরূপ কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে না, যাতে সাধারণ মানুষের মৌলিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক বিত্তশালী লোকের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী যোগানের সুযোগ বেশী হয়। কারণ এ আদর্শ ও শিক্ষা ভোগবাদের মূলোৎপাটন করে একটা সরল

www.pathagar.com

ও মধ্যপন্থী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজকে অনুপ্রাণিত করে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. তাফসীরে রূহুল মা'আনী, মাহমূদ আলূসী (র)।
২. আল-মুফরাদাত, রাগেব ইস্পহানী, পৃ. ৪৫০-৫৪।
৩. তাফসীরে রূহুল মা'আনী, মাহমূদ আলূসী (র), ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩-৩৪।
৪. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (র), ফী-যিলালিল কুরআন, ২য় খণ্ড।
৫. তাফসীরে কবীর, ইমাম ফখরুদ্দীন আর রাযী (র), ১২শ খণ্ড, পৃ ২০০-২০২।

www.pathagar.com

কতিপয় নিষিদ্ধ কাজ : অর্থনৈতিক তাৎপর্য

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ * وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ط وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ *

বলুন! এসো, আমি তোমাদেরকে ঐ সব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করবে, নিজেদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দেই। নির্লজ্জতার কাছেও যেও না, প্রকাশ্য হোক কি অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তাকে হত্যা করো না, অবশ্য সত্য ও ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা বুঝে কাজ কর। ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না, কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত দায়িত্বের বোঝা দেই না। আর যখন কথা বল ইনসাফের সাথে কথা বল, যদিও সে আত্মীয় হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এ সব বিষয়েই আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

(সূরা আল-আন'আম : ১৫১-১৫২)

আয়াতদ্বয়ের সাধারণ তাৎপর্য

সূরা আন'আমের এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ পাক নয়টি কাজকে নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করেছেন এবং এ সব কাজ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশ মত চলা ও এ সব কাজ থেকে বিরত থাকা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। প্রথমত, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করাকে হারাম করা হয়েছে। শিরক

www.pathagar.com

অর্থ আল্লাহর বিশেষ গুণাবলী, আল্লাহর ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও অধিকারে অন্যকে অংশীদার করা। যেমন আল্লাহর বিশেষ গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি সব কিছু জানেন ও শোনেন। অন্য কারো সম্পর্কে এ ধারণা করা যে, তিনিও গায়েব জানেন বা সবকিছু শোনেন ও জানেন- এরূপ মনে করলে শিরক করা হবে। তেমনিভাবে কারো সম্পর্কে ধারণা করা যে, তিনিও অতি-প্রাকৃতিক উপায়ে কারো ভাগ্য রচনা বা নষ্ট করতে পারেন বা অতি-প্রাকৃতিক উপায়ে কারো উপকার বা অপকার করতে পারেন তা শিরক বলে গণ্য হবে। আল্লাহর জন্য যেমন আমরা রুকূ, সিজদা করি বা যে বিনয়ের সঙ্গে তাঁর সামনে দাঁড়াই, অন্যের জন্য এমন করাও শিরক হবে। তারপর পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহারের আদেশ করা হয়েছে অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হারাম। এ আয়াতে দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আরবে ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে অনেক সময় জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে নিজ হাতে সন্তানদের হত্যা করা হত। আল্লাহ পাক এ জঘন্য প্রথা হারাম করে দিয়েছেন। তারপর ফাওয়াহেশ বা নির্লজ্জ কাজ কারবার সবই নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যেই হোক কি গোপনেই হোক। কুরআন, হাদীসের পরিভাষায় 'ফাহেশা' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ যার অনিষ্টতা সুদূরপ্রসারী, যাবতীয় বড় গোনাহ এর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থ নেয়া হলে যাবতীয় বদ অভ্যাস, মুখ, হাত, পা ও অন্তরের যাবতীয় গুনাহই এর আওতায় এসে যায়। ফাহেশা কাজের নিকটে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাকা এবং ঐ সব পন্থা থেকে দূরে থাকা, যা দ্বারা ঐসব গুনাহের পথ খুলে যায়। তারপর আল্লাহ পাক বৈধ কারণ ছাড়া অন্য সব হত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন কেউ যদি অন্যকে হত্যা করে তাকে হত্যা করা যাবে। অবশ্য আইন মোতাবেক বিচার ফয়সালার মাধ্যমেই তা হবে। বিনা কারণে মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, অমুসলিমকে হত্যা করাও তেমনি হারাম। তারপর ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ হারাম করা হয়েছে। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীমদের অভিভাবকদের মূলত সম্বোধন করা হয়েছে, যেন তারা অবৈধভাবে ইয়াতীমদের মাল নষ্ট না করে। অর্থাৎ ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণ করা এবং কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা অভিভাবকের কর্তব্য। অবশ্য বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের এ দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। তারপর সঠিক ওজন ও মাপ দিতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ ওজন ও মাপে ত্রুটি করা ও কম করা হারাম। তারপর কথা বলার সময় ইনসাফের সঙ্গে কথা বলতে আদেশ করা হয়েছে তা যদি আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও হয়। অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা হারাম গণ্য করা হয়েছে। সাক্ষ্য কিংবা ফয়সালায় কারও বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা এবং শত্রুতা ও বিরোধিতার কোনো প্রভাব থাকা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (স) মিথ্যা সাক্ষ্যকে শিরকের সঙ্গে

www.pathagar.com

তুলনা করেছেন।[১] রাসূলুল্লাহ (স) অসত্য ফয়সালাকারী বিচারককে জাহান্নামী বলে উল্লেখ করেছেন।[২] সর্বশেষ আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম। আল্লাহর অঙ্গীকার বলা হয়েছে যার অর্থ আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ও আল্লাহর নামে করা অঙ্গীকার। ঈমান আনার অর্থই হচ্ছে আল্লাহকে সব বিষয়ে মেনে চলার অঙ্গীকার। সৃষ্টির শুরুতেও আদমের সব সন্তানের রূহ আল্লাহকে মেনে চলার অঙ্গীকার করেছিল। এসব অঙ্গীকারই রক্ষা করা ফরজ। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর দেয়া এ সব বিধি-নিষেধকেই সহজ সরল পথ বলা হয়েছে এবং তা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।[৩]

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ সব আয়াতে আল্লাহ পাক মানবতাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। শিরক না করার আদেশের মধ্যে এ শিক্ষা রয়েছে যে, অর্থনীতি কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তার শিক্ষা ও মূলনীতি আল্লাহ পাক থেকেই নিতে হবে। আয়াত দু'টিতে যে নয়টি বিষয়ের নির্দেশ রয়েছে তার প্রত্যেকটিরই আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, শিরক এড়িয়ে চলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে (বিশেষ করে ইকবাল, মওদূদী, আবুল হাশিম, সাইয়্যেদ কুতুব, মুহাম্মদ কুতুব প্রমুখ আধুনিক চিন্তানায়কের রচনায় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। পূর্বতন চিন্তানায়কদের মধ্যে শায়খ আহমদ সরহিন্দ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব সমধিক খ্যাত)। সমাজ ব্যবস্থা, রুচি প্রভৃতি ব্যাপারেই শিরকের প্রভাব এড়িয়ে চলা মুসলিম জীবনে অপরিহার্য। এখানে এটা প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে। এটি আর্থ-সামাজিক জীবনে ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারীদের বিশেষ অধিকার ও জাঁকজমক এ কারণে সীমিত হবার কথা, এটা একটা উদাহরণ। এর অন্যতম অহেতুক ব্যয় হ্রাস ও যুক্তিসঙ্গতভাবে ক্ষমতা ও জাঁকজমক প্রদর্শন আল্লাহর নির্দেশ মত, অন্য রাষ্ট্রের অনুকরণে নয়।

এখানে পিতা-মাতার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। এখানে যে নীতি দেয়া হয়েছে এবং কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য বিধি-বিধানের আলোকে যে সব পিতা-মাতা তাদের নিজেদের ভরণপোষণ করতে সক্ষম নন, তাদের ভরণপোষণ সন্তানদের উপর ওয়াজিব। ইসলাম এমন এক সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় যেখানে পিতা-মাতারা বিপদাপন্ন হবেন না এবং যেখানে অক্ষম বৃদ্ধদের চাপ সরকারের উপর নিপতিত হবে না। সরকারের উপর অতিরিক্ত বোঝা কোনো সমাজের জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না। তাই সন্তানরা সক্ষম হলে ইসলাম অক্ষম পিতা-মাতার দায়িত্ব সন্তানদের উপর দিয়েছে। যদিও এসব বিষয়ে

www.pathagar.com

আমাদের ফিকহের গ্রন্থসমূহে অনেক আলোচনা রয়েছে। তথাপি কার্যকর করার সুবিধার্থে এ ব্যাপারে পার্লামেন্ট কর্তৃক বিস্তৃত আইন রচনা করা প্রয়োজন, যা সহজেই প্রয়োজন হলে এমনকি কোর্টসমূহও কার্যকর করতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে শুধু ভরণপোষণের দায়িত্ব সূচকই নয়। অধিকন্তু আধুনিক Social Security system অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করার দ্যোতক, যাতে মায়া-মমতা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-দয়া প্রভৃতি মানবিক গুণসহ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা থাকে।

তৃতীয়ত, একমাত্র আল্লাহই যে রিযকদাতা- এ সত্যের উপলব্ধি মানুষের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন এবং তদনুসারে তাদের আচরণ তাওহীদী যুক্তিভিত্তিক হওয়া উচিত। এটা শুধু পরিবার পরিকল্পনার প্রশ্নে নয়। সর্ববিষয়ের আচরণেরই হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় নীতি ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আচরণ সবই এভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

হত্যা নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক নির্দেশের সঙ্গেই বিচার ও কুরআন নির্দেশিত শাসন ব্যবস্থার প্রশ্ন আছে। এ বিষয়ে ইজতিহাদ প্রয়োজন।

দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা এ আয়াতে সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে, তা যেভাবেই হোক। কাজেই জনশক্তি পরিকল্পনায় যে কোনো ধরনের গর্ভপাত বা ভ্রূণ হত্যার স্থান থাকতে পারে না।

এখানে নির্লজ্জতা হারাম করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির উৎপাদন ব্যবস্থায় এর বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। অশ্লীল দ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রি, আমদানী, রপ্তানী সবই ইসলামী রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে এসব উৎপাদন করা যাবে না। এসব উৎপাদনে ব্যাংকসমূহও বিনিয়োগ করতে পারে না।

ইয়াতীমদের ধন সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্র বিশেষ খেয়াল রাখবে। তা সংরক্ষণ ও সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্র প্রয়োজনে আইন রচনা করবে। ইয়াতীম ও অন্য বঞ্চিতজনের সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর যে শিক্ষা রয়েছে তাতে প্রমাণ হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র সর্বাবস্থায় অক্ষম দরিদ্র ও বঞ্চিতদের ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখবে। এটি ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এখানে সঠিক মাপ ও পরিমাণ দেয়া ফরয করা হয়েছে। সঠিক মাপ ও পরিমাণের উপর অর্থনীতির অগ্রগতি নির্ভর করে। সঠিক মাপ ও পরিমাণ না থাকলে পরবর্তীতে কোনো আস্থা থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্র তা পুরাপুরি রক্ষা করার চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে যারা ইসলামী আইনকে ভঙ্গ করবে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ইসলামী অর্থনীতি রক্ষার জন্য তা অপরিহার্য । যদি শ্রমিক-

www.pathagar.com

কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দেয়, তাও মাপে কম দেয়ার আওতায় আসে। শ্রমিক-কর্মচারীদের এ বিষয়ে ইসলামী সমাজে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে। তেমনি শ্রমিক-কর্মচারীকে উপযুক্ত বেতন না দেয়াও এর আওতায় আসে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় অবশ্যই শ্রমিক-কর্মচারীকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে। অবশ্য সাধ্যের বাইরে না শ্রমিক-কর্মচারী করতে বাধ্য না কর্তৃপক্ষ, কেননা আল্লাহ কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত করতে বাধ্য করছেন না।

১৫২ নং আয়াতের 'আমি কাউকে সাধ্যাতিরিক্ত দায়িত্ব দেই না' বাক্যাংশের ব্যাপক অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে কর আরোপ, কাজের সময় নির্ধারণ- যেমন পারিশ্রমিক নির্ধারণ ও অন্য সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামর্থ্যের দিকে খেয়াল রেখে করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন, পার্লামেন্ট, বিচার বিভাগ সবাইকে এ মূলনীতি সামনে রাখতে হবে। তেমনি সুবিচার করা এবং আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করাও অর্থনৈতিক তাৎপর্যবহ। সুবিচার করা অর্থনীতিতে আস্থা ও শৃঙ্খলা নিয়ে আসে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার মধ্যে গোটা ইসলামী শিক্ষা মেনে চলাই অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ অবশ্যই অর্থনীতিতে সততা, বিশ্বস্ততা, উদ্যোগ, ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতা আনবে। তবে তা কেবল কথায় হবে না, আইনের মাধ্যমে সব ইসলামী শিক্ষাকে কার্যকর করতে হবে।

আল্লাহর অঙ্গীকার বা আল্লাহর সঙ্গে মানুষের কৃত অঙ্গীকার অত্যন্ত বড় দায়িত্ব দ্যোতক। 'খলীফাতুল্লাহ' হিসেবেও এরূপ মানুষের এ বড় দায়িত্ববোধটা তার ছোট ছোট প্রয়োজনের বা কল্পিত প্রয়োজনের চাপে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। কুরআনের শিক্ষা অবলম্বন করে মানুষের এ ভুলটা ভাঙতে পারে।

আলোচ্য আয়াত দু'টিতে যে সব মূলনীতি দেয়া হয়েছে তার যেমন রয়েছে নৈতিক, সামাজিক ও ব্যাপক সাধারণ তাৎপর্য, তেমনি রয়েছে ব্যাপক অর্থনৈতিক তাৎপর্য। এ সব মূলনীতি অনুসরণ অর্থনীতিকে উন্নত ও দক্ষ রাখতে বাধ্য। এভাবেই এ আয়াত দু'টি মানুষের সঠিক পথ-নির্দেশের জন্য। এ থেকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোত্রগত, জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ও সর্ববিধ দায়িত্ব বিষয়ে হেদায়াত পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আবু দাউদ ও ইবন মাজা।
২. আবু দাউদ।
৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন।
৪. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, তাফসীরে তাফহীমুল কুরআন।

www.pathagar.com

অপব্যয় সম্পর্কে

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ * قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ *

হে বনী আদম! প্রত্যেক ইবাদতের সময় ও ক্ষেত্রে তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। খাও এবং পান কর কিন্তু অপব্যয় করো না। আল্লাহ অপব্যয়ীকে পছন্দ করেন না। বল, কে আল্লাহ তাঁর স্বীয় বান্দাদের জন্য যে সব সুন্দর বস্তু (উপহার) ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা নিষিদ্ধ করেছে? বল, পার্থিব জীবন বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এসব তাদের জন্য যারা ঈমান আনে। এরূপে যারা বুঝে সে লোকদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি। বল, আমার প্রতিপালক যে সকল বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন তা হল প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি (সীমালংঘন) এবং কোনো কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। (সূরা আল-আ'রাফ : ৩১-৩৩)

শাব্দিক ব্যাখ্যা

যীনাত (زينة) শব্দের অর্থ সৌন্দর্য, পোশাক, অলঙ্কার। মুফাসসিরদের মতে, এ আয়াতসমূহে 'যীনাত' অর্থ পোশাক-পরিচ্ছদ। তাইয়্যেব (طيب) শব্দের অর্থ পাক-পবিত্র, উৎকৃষ্ট, কল্যাণকর, যা ক্ষতিকর নয়।

'ইসরাফ' (اسراف) শব্দের অর্থ অপব্যয়, অমিতাচার, সীমালংঘন, বাস্তবিকই যার প্রয়োজন নেই। মুফাস্‌সিরদের মতে, ৩১ নং আয়াতে উল্লেখিত 'ইসরাফ' ( ) শব্দের অর্থ হারাম খাওয়া, অমিতাচার (অপব্যয়) করা ও সীমালংঘন করা।

www.pathagar.com

আয়াত নাযিলের প্রেক্ষিত

তদানীন্তন জাহিলী যুগে আরবের পুরুষেরা দিনে ও নারীরা রাতের বেলায় উলংগ হয়ে কাঞ্চবা ঘরের তাওয়াফ করতো। তারা বলতো, যে পোশাকে আমরা গুনাহ করেছি সে পোশাকে আমরা তাওয়াফ করবো না। আবার কেউ কেউ বলতো-এ কাজ আমরা শুভ বিবেচনা করে থাকি অর্থাৎ যেমন আমরা কাপড় শূন্য তেমনি আমরা পাপশূন্য হয়ে যাবো। হজ্জের সময় তারা হজ্জের সম্মানার্থে শুধু প্রাণে বাঁচার জন্য সামান্য আহার করতো, চর্বি আদৌ খেতো না। এসব দেখে মুসলমানরা বলল- ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমরা মুসলমান, আমরাই তো এ ধরনের পদ্ধতি পালনের বেশী হকদার। এ প্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।১

তাফসীরকারদের মতামত

ক. كلوا واشربوا ولاتسرفوا، আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর। তোমার উপর দোষারোপ নেই; কিন্তু দু'টি অভ্যাস বড় খারাপ।

এক. অমিতাচার বা সীমালংঘন, দুই. অহংকার বা অহমিকা।

আবদুর রহমান ইবন যায়েদ বলেন : 'ولا تسرفوا' শব্দের অর্থ তোমরা খাও কিন্তু হারাম খেয়ো না। কেননা এটা বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন।২

খ. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী (র) লিখেছেন, এখানে 'যীনাত' শব্দের অর্থ কাপড় পরিধান করা বোঝানো হয়েছে 'خذوا زينتكم عند كل مسجد' আয়াতের দাবী হচ্ছে প্রতিটি নামাযে পরিপূর্ণ লেবাস পরিধান করা ওয়াজিব। কেননা পরিপূর্ণ লেবাসকেই 'যীনাত' বলা হয়। 'كلوا واشربوا ولا تسرفوا' আয়াত পরিভাষাগত দিক দিয়ে মুতলাক অর্থাৎ সব সময় ও সব অবস্থাকেই বোঝায় এবং সব রকম খাদ্য খাবার ও পানীয় বস্তুকেই অন্তর্ভুক্ত করে যতক্ষণ না এর ব্যতিক্রমে কোনো স্বতন্ত্র দলীল পাওয়া যায়। 'যীনাত' শব্দটি সব রকমের সাজ-সজ্জাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব সবদিক দিয়ে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বিধান করা, যানবাহন ব্যবহার এবং নানাবিধ অলংকার ব্যবহারও এর অন্তর্ভুক্ত।৩

গ. আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথী তাফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন, 'যীনাত' অর্থ এখানে পোশাক-পরিচ্ছদ। তাফসীরকারদের ঐকমত্যে তাই বোঝানো হয়েছে। মুজাহিদ, কালবী ও ইবন আব্বাসেরও তাই মত।

'মসজিদ' অর্থ এখানে সিজদার স্থান বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটির অর্থ করা হয়েছে, তোমরা প্রত্যেক মসজিদেই কাপড় পরিধান কর তা তাওয়াফের জন্যই হোক বা নামাযের জন্য। গোটা নামাযকেই বোঝানো হয়েছে...।

www.pathagar.com

এ আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, পানাহার ও আচ্ছাদনের পর্যায়ে অনুসৃত নীতি (উসূল) হচ্ছে সব বস্তুই হালাল, যে পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত না হয়।

ঘ. ফী-যিলালিল কুরআন প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) লিখেছেন, আয়াতটির তাৎপর্য কেবল সালাতের সময় বেশভূষা এবং পবিত্র বস্তু পানাহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ঐসব যীনাতের সামগ্রী যা বান্দার জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তা হারাম করাকে নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহর দেয়া পোশাক ও পবিত্র খাবার কেউ স্বাধীন ইচ্ছামত হারাম করে নিক- এটা নিন্দনীয় ব্যাপার। কেননা আল্লাহর দেয়া শরীয়ত ব্যতীত কারো এ ব্যাপারে কোনো অধিকার নেই।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

ইসলামী অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত বেশকিছু নীতি ও শিক্ষা এ আয়াত ক'টিতে বলা হয়েছে। ৩১ নং আয়াতে ইসলামে ভোগ (Consumption)-এর নীতি ও সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, খাওয়া ও পানকে কেবল হালালই করা হয়নি বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ইসলামে বৈরাগ্যবাদ বা জীবন বিমুখতার কোনো স্থান নেই। এ নীতির ফলে ইসলামী সমাজে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আল্লাহর নির্দেশাবলীর সীমার মধ্য থেকে আনন্দময় ভোগ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অবশ্য ভোগ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইস্‌রাফকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'ইস্‌রাফ' বলতে মুফাস্‌সিরগণ বুঝিয়েছেন 'হারাম খাওয়া' ও 'অতিরিক্ত পানাহার করা'। 'ইসরাফ' না করার নীতির ব্যাপক ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ের তাৎপর্য রয়েছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটি একটি নৈতিক নীতি হিসেবে কাজ করবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের পর্যায়ে ঠিক করবে যে, তার কি ভোগ-ব্যবহার করা উচিৎ এবং কি করা উচিত নয়। অবশ্য এ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় নীতিও আইনের সীমার মধ্যেই সে প্রয়োগ করতে পারবে। এ কথাও সত্য যে, ব্যক্তি পর্যায়ে ইসরাফ কাল ও স্থানের পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল হবে। এ জন্যই এর কোনো সর্বকালীন সীমা কোনো আইনে বা বিধিতে ঠিক করে দেয়া সম্ভব হবে না।

সামাজিক পর্যায়ে'ইসরাফ' সংক্রান্ত নীতি আরো ব্যাপকভাবে অনুসৃত হবে। সরকারের পরিকল্পনা, আমদানী-রপ্তানী, উৎপাদন, বন্টননীতি এমনভাবে তৈরী হতে হবে, যাতে সে সময়ের প্রেক্ষিতে সে দেশে 'ইসরাফ' উৎসাহিত না হয় এবং ব্যক্তিপর্যায়ে ইস্‌রাফ করার সুযোগ কমে যায়। সরকার নিজেও 'ইসরাফ' পরিহার করবেন। ইসলামী নীতিতে তা-ই আদর্শও কাম্য। এ আয়াতে এ কথাও স্পষ্ট যে, Consumerism ইসলামের নীতি নয়। সম্পদ থাকলেও নয়। কেননা তাতে মানুষ বস্তুবাদী ও ভোগবাদী হয়ে যায় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যাবার বেশী আশঙ্কা থাকে। এ ব্যাপারে ইসলামী অর্থনীতিতে মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

সরকারী পর্যায়ে 'ইসরাফ' বর্জনের নীতিতে একদিকে তথাকথিত Prestige প্রকল্পের পরিবর্তে এমন সব প্রকল্প হাতে নিতে হবে যাতে দরিদ্র ও অপেক্ষাকৃত ভাগ্যাহত লোকদের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হয়, অপরদিকে জনসাধারণের উপর আরোপিত কল্যাণহীন করের বোঝা অপেক্ষাকৃত হালকা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যারা অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ করতে অক্ষম এবং নগ্ন কিংবা অর্ধনগ্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করতে (বা নামায পড়তে) বাধ্য হচ্ছে কিংবা অনাহার, অর্ধাহার, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবে জীবন যাপন করছে, তাদের সমস্যা সমাধানেও সমাজ তথা রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামী সমাজে যতদিন পর্যন্ত একজন লোকও এ জাতীয় সমস্যার আবর্তে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কোনো মুসলমানের পক্ষে তার নিজের ও পরিবারবর্গের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত কোনো খরচ 'ইসরাফ' বলে গণ্য হতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন মান উন্নত হবে, এটাই কাম্য।

'আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর স্বীয় নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন।' ৩২ নং আয়াতে 'পবিত্র' কথাটির উল্লেখ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী অর্থনীতিতে অপবিত্র, মানুষের স্বাস্থ্য ও মানসিকতার জন্য ক্ষতিকর কোনো বস্তুর স্থান নেই। এ শব্দটি সে দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ নীতিও কার্যকর করতে হবে। এ আয়াত ও পরবর্তী ৩৩ নং আয়াত প্রমাণ করে যে, মূলত কোনো জিনিসকে হারাম করার অধিকার কেবল আল্লাহর। রাসূল (স) যা কিছু হারাম করেন তাও আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা বলেই। যেমন সূরা আ'রাফেই ১৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে- উম্মী নবী তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে। সূরা আ'রাফের ৩৩ নং আয়াত ও কুরআনের অন্যান্য জায়গায়ও রাসূল কর্তৃক খুব কম দ্রব্যই হারাম করা হয়েছে। এছাড়া বাকী সবই হালাল। এ নীতি মানুষ ও অর্থনীতির জন্য খুবই কল্যাণকর হয়েছে। বস্তুত মানব জীবন ও সমাজের জন্যে অকল্যাণকর দ্রব্যাদি এবং কার্যাবলী হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ মানুষের প্রতি বিরাট ইহসান করেছেন। অন্যদিকে নির্দিষ্ট কতিপয় হারাম ছাড়া বাকী সবই হালালের পর্যায়ে রেখেও আল্লাহ আমাদের অর্থনৈতিক জীবন তথা উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন নির্বাচনের এক বিশাল ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নে অতীব সহায়ক।

গ্রন্থপঞ্জী

১. তাফসীরে কবীর, সূরা আ'রাফের ৩১-৩৩ নং আয়াতের তাফসীর।
২. তাফসীর ইবন কাসীর, সূরা আ'রাফের ৩১ নং আয়াতের তাফসীর।
৩. তাফসীরে কবীর, সূরা আ'রাফের ৩১ নং আয়াতের তাফসীর।
৪. তাফসীরে মাযহারী।

www.pathagar.com

সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষার সামগ্রী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ *

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। নিজেদের আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করো না। আর জেনে রাখ তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী। আল্লাহর নিকটই রয়েছে মহাপুরস্কার। (সূরা আনফাল : ২৭ ও ২৮)

আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

২৭ নং আয়াতে হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল ইবাদত- উভয়ই উল্লিখিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্বে এ বিষয়ে চেতনা এত কম যে, তা শূন্যের কোঠায়; তাই আয়াতটির প্রাসঙ্গিকতা সুস্পষ্ট। হকুক সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অনীহা উভয়ই এ জন্য দায়ী। তবে এ আয়াতে জ্ঞাতসারে অনীহার কথা উল্লিখিত হয়েছে। স্পষ্টতই এটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। ২৮ নং আয়াতে ২৭ নং আয়াতের বক্তব্যের জের টেনেই বলা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ লাভ ও সন্তান-সন্ততির কল্যাণ কামনাহেতু লোকে হকুক ভুলে যায়। এতে করে তারা আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই ভুল করে বসে। পার্থিব জীবনে যা লাভ বলে মনে হয় তা প্রকৃত লাভ নাও হতে পারে। প্রকৃত পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর কাছেই, আর তার গুণগত মান অতি উচ্চ, পরিমাণও বিপুল।

এই যে আল্লাহর কালামে উল্লিখিত সত্য, ঈমানদার ব্যক্তির উত্তম আচরণ নিশ্চিতকরণের জন্য এটা যথেষ্ট হবার কথা। মু'মিনদের আর্থ-সামাজিক জীবন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য এটাই পথ-নির্দেশ। এখানেই আয়াত দু'টির বিশেষ গুরুত্ব।

তাফসীরকারদের আলোচনা

সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন : 'নিজেদের আমানত বলতে সেই সব দায়িত্ব বোঝানো হয়েছে, যা সবের প্রতি আস্থা স্থাপন করে তার উপর ন্যস্ত করা হয়। তা ওয়াদা পূরণের দায়িত্ব হতে পারে। কিংবা কোনো সংস্থার অভ্যন্তরীণ গোপন তথ্য হতে পারে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন-সম্পদ হতে পারে। কারো প্রতি ভরসা করে জনসমাজ যদি তাকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করে তবে তাও এর মধ্যে শামিল বলে মনে করতে হবে।

www.pathagar.com

মানুষের ঈমানের প্রতি নিষ্ঠা ও সততায় সাধারণত যে জিনিস দোষ-ত্রুটির উদ্ভব করে আর যে কারণে প্রায়ই মানুষ মুনাফিকী, বিশ্বাসঘাতকতা ও খিয়ানতে লিপ্ত হয় তা অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সন্তান-সন্ততির স্বার্থের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ ও উৎসাহ। এ কারণে এখানে বলা হয়েছে যে, এ ধন-সম্পদ যার ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে তোমরা সাধারণত সত্য ও সততার পথ হতে গোমরাহ হয়ে যাও, তা আসলে এ দুনিয়ার পরীক্ষাগারে তোমাদের পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র। তোমরা যাকে পুত্র বা কন্যা বল তা আসলে পরীক্ষার একটি কাগজ মাত্র। আর যাকে তোমরা জমি জায়গা ও ব্যবসার সম্পত্তি মনে কর, তা আসল পরীক্ষার আর একটি কাগজবিশেষ। এসব জিনিস তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, এ সবের দ্বারা তোমাদেরকে যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে।[১]'

মুফতী মুহাম্মদ শফী লিখেছেন : ২৭ নং আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার হকসমূহ কিংবা পারস্পরিকভাবে বান্দার হকসমূহের খেয়ানত করো না। হক আদায়ই করবে না কিংবা আদায় করলেও কোনো রকমে শৈথিল্যের সাথে আদায় করবে- এমন যেন না হয়। আয়াতের শেষভাগে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তো খেয়ানতের অপকারিতা ও বিপদ সম্পর্কে জানই। তারপরেও সেদিকে পদক্ষেপ না নেয়া মোটেও বুদ্ধিমত্তার কথা নয়। আর যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফলতি ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণত মানুষের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে; এ কথা জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা।

'ফিতনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়, আযাবও হয়। এছাড়া এমন সব বিষয়কেও 'ফিতনা' বলা হয় যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ তিন অর্থেই ফিতনা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুত এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে।[২]'

আর্থ সামাজিক তাৎপর্য

এ দু'টি আয়াতে ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে। আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর সঙ্গে খেয়ানত না করার তাৎপর্য হচ্ছে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষা মানতে বাধ্য। কোনো অবস্থাতেই আমরা তা ভঙ্গ করতে পারি না বা পাশ কাটিয়ে যেতে পারি না। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম দেশের পার্লামেন্টকে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

২৭ নং আয়াতে আমানতে পারস্পরিক বিশ্বাস ভঙ্গ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমানতের ব্যাপক অর্থ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আমানতের এ গুরুত্ব

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক বিষয়। অর্থনীতির সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা বিশ্বাস বা আমানতদারীর উপর নির্ভর করে। অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলা হয় credit worthiness, এটা আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার ভিত্তি। ইসলাম সমাজ ও অর্থনীতিতে এরই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যদি আমানতদারী অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋণ দান, ঋণ গ্রহণ, বিনিয়োগ সবই নিরাপদ ও সহজ হয়ে যাবে। সে অবস্থায় উৎপাদন ও সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। অবশ্য ইসলামী রাষ্ট্রকে শিক্ষা, তথ্য-মাধ্যম ও সামাজিক পত্রিকায় প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে আমানতদারী সৃষ্টি করতে হবে। তবেই তার ফল পাওয়া যাবে।

২৮ নং আয়াতে লোভ-লালসা ও স্বজনের অতিরিক্ত প্রীতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। ধন-সম্পদ পরীক্ষার সামগ্রী। এর তাৎপর্য এই যে, ধন-সম্পদকে সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক নিজের জন্য এবং অন্যের জন্য ব্যবহার করতে হবে। ধন-সম্পদকে অবৈধভাবে ও অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা যাবে না। ধন-সম্পদ অপব্যয় ও নষ্ট করা যাবে না। মানব কল্যাণেই তার প্রয়োগ হতে হবে। এখানে ভোগ্য ব্যবহারের (consumption) কি নীতি হবে, তারও ইঙ্গিত রয়েছে। এ নীতিকে ভিত্তি করে পরিকল্পনা কমিশনও জাতির জন্য ভোগ্য ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ করতে পারেন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনফালের ২২ ও ২৩ নং টীকা।
২. মা'আরেফুল কুরআন, সূরা আনফালের ২৭-২৮ আয়াতের তাফসীর।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা প্রসঙ্গে

قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ
اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِىْ
الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ *

বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, সন্তান, ভ্রাতা, পত্নী, আত্মীয় স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য যার মাঝে মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবা স তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত। আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধচারীদের সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

(সূরা আত-তাওবা : ২৪)

প্রেক্ষিত

২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, জন-সম্পদ ও অর্থ-সম্পদ যদি আল্লাহর ভালোবাসা, রাসূলের ভালোবাসা ও আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তবে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

আয়াতের সাধারণ তাৎপর্য

আয়াতে মু'মিনের জীবনে আল্লাহর পথে জিহাদের গুরুত্বের আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক মু'মিনের নিকট অবশ্যই আল্লাহ, রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ সব ধরনের রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা, ধন-সম্পদ, দেশ, বাসস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা প্রাধান্য পেতে হবে। আত্মীয়তা ও ধন-সম্পদ কখনো মু'মিনের নিকট আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদের উপর প্রাধান্য পেতে পারে না। যদি কখনো আত্মীয়তা, ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য এবং আল্লাহর পথে জিহাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা হলে আল্লাহ, রাসূল ও

www.pathagar.com

জিহাদকেই গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর পথে জিহাদ বলতে বোঝায় নিজেকে ইসলামের উপর কায়েম রেখে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে ব্যস্ত রাখা ও জুলুম, নিপীড়নের উৎখাত এবং মজলুমদের সাহায্য করার জন্য সংগ্রাম করা। আল্লাহ কুরআনের বহু আয়াতে ও আল্লাহর রাসূল তাঁর হাদীসের এসবের জন্য জিহাদ করার তাকীদ দিয়েছেন।

তাফসীরকারদের আলোচনা

এ আয়াতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিখ্যাত তাফসীরকার সাইয়্যেদ কুতুব লিখেছেন, এটা কখনো জীবনের উদ্দেশ্য নয় যে, একজন মুসলিম পরিবার-পরিজন, আত্মীয়তার সম্পর্ক, ধন-সম্পদ, পার্থিব ভোগ বর্জন করবে এবং জীবনে বৈরাগ্য অবলম্বন করবে আর আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা প্রাধান্য পাবে। যখন তা সম্পন্ন হবে তখন তার জন্য জীবনের সর্ববিধ পবিত্র বস্তু থেকে উপকৃত ও লাভবান হওয়াতে কোনো দোষ নেই। মূল প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কি তোমার ঈমানী আকীদা দ্বারা পরিচালিত হবে, না দুনিয়ার ভোগ ব্যবহার তোমাকে পরিচালিত করবে? যখন মুসলমান এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, তার আকীদা ও ধ্যান-ধারণা পরিশোধিত হয়ে গেছে তখন তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র থেকে লাভবান হওয়া দোষণীয় নয়। অনুরূপভাবে দোষণীয় নয় ধন-সম্পদ ব্যবসা-ব্যাণিজ্য ও গৃহাদি থেকে লাভবান হওয়া এবং যার জন্য নেই কোনো বাধা যদিও এ সবের ভোগ ব্যবহারে ইনসাফ ও অহংকার না থাকে। বরং এ সব থেকে উপকৃত হওয়া সম্পূর্ণ বৈধ ও মুস্তাহাব। কারণ এ নিয়ামত পাওয়ার পর তা শোকরগুজারীর রূপ নেয়। এভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় রক্ত ও বংশের সম্পর্ক, ছিন্ন হয়ে যায় অধিকার সম্পর্ক। অতএব আল্লাহর জন্যই প্রাথমিক নৈকট্য আর এর উপরই রচিত হয় মানবীয় সকল সম্পর্ক।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ আয়াত থেকে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড পাওয়া যায়। ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থ, সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের নিশ্চয়ই গুরুত্ব রয়েছে, যা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ও হাদীসে বর্ণিত আছে। কিন্তু এ সব কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ ও রাসূল অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যাবে না। অন্য কথায়, অর্থ-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই আল্লাহ ও রাসূলের নির্ধারিত আইন, বিধান, সীমা ও নির্দেশনার অধীনে হবে। সম্পদের ভোগ-ব্যবহার উন্নয়ন, বিনিময়, ব্যয় সবকিছুই আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষার অধীন হবে।

আমাদের অর্থনীতিবিদ, আমাদের পরিকল্পনা কমিশন ও সরকারকে তাঁদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী ও কার্যকর করার সময় এই নীতিটি মনে রাখতে

www.pathagar.com

হবে। এটা করা তাদের উপর ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক। তা না করা হলে এ আয়াতে যেমন বলা হয়েছে তারা আল্লাহ তা'আলার আযাবের উপযুক্ত গণ্য হবে।

এ আয়াতে অন্য যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে জিহাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থ কিভাবে সমন্বিত হবে। অথবা জিহাদের সময় অর্থনীতিকে কিভাবে বিন্যাস করা হবে। এখানে অবশ্য শরীয়ত সমর্থিত জিহাদের কথা বলা হচ্ছে, অবৈধ যুদ্ধের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এ আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, জিহাদের প্রয়োজনে প্রত্যেক মু'মিনকে তার ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বা সম্পদের ক্ষতি কোনো মু'মিনকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় না। নীতিগতভাবে রাষ্ট্র ও গোটা মুসলিম সমাজের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য। আয়াতে গোটা মু'মিন সমাজকেই সম্বোধন করা হয়েছে, এ কথাও লক্ষণীয়। জিহাদের প্রয়োজনে অথবা জিহাদ করা যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তখন ইসলামী রাষ্ট্রকে তার জিহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য সব অর্থনৈতিক ক্ষতি সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আরো বলা যায় যে, জিহাদের সময়ে জিহাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে সফলভাবে জিহাদ পরিচালনা করা যায়। কাজেই সূরা তাওবার এ আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে- একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

১. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *ফি যীলালিল কুরআন*, মিসর।

২. সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ, *ফি-যীলালিল কুরআন*, মিসর।

www.pathagar.com

খিলাফতের অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ *

অতঃপর আমরা তাদের পর পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কি প্রকার আচরণ কর তা দেখার জন্য। (সূরা ইউনুস :) ১৪

'খলীফা' শব্দের ব্যাখ্যা

খলীফা (خليفة) এ আয়াতে 'খালায়েফ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর একবচন হচ্ছে 'খলীফা'। এটি কুরআন মজীদে ব্যবহৃত একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। 'খলীফা' শব্দের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন : 'খলীফা' তাকে বলা হয়, যে অন্য কারো মালিকানায় তারই প্রদত্ত ক্ষমতা ইখতিয়ার ব্যবহার করে। খলীফা কখনো মালিক হতে পারে না। প্রকৃত মালিকের ইচ্ছা, কামনা অনুসরণ করা তার কর্তব্য হয়।

এমতাবস্থায়, সে যদি নিজে মালিক হওয়ার দাবী করে বসে এবং মালিক প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ খামখেয়ালীভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে কিংবা প্রকৃত মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক মনে করে তারই ইচ্ছা বাসনা অনুসরণ এবং তারই আদর্শ পালন করতে শুরু করে, তবে তা হবে বিশ্বাসঘাতকতামূলক পদক্ষেপ।

তাফসীরকারদের মতামত

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী লিখেছেন, 'পূর্ববর্তী জাতি সম্প্রদায়ের ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি এবং পৃথিবীর খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করেছি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করো না যে, পৃথিবীতে খিলাফতী কেবল ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। বরং এই মর্যাদা ও সম্মান দানের আসল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পরীক্ষা নেয়া, তোমরা কি বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থা সংশোধন কর, না রাষ্ট্র ও ধন-দৌলতের নেশায় উম্মত্ত হয়ে পড়। এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো অহঙ্কারের বিষয় নয় বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়-দায়িত্ব।

-মা'আরেফুল কুরআন, সূরা ইউনুসের ১৪ নং আয়াতের তাফসীর।

www.pathagar.com

আয়াতের সাধারণ অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সূরা ইউনুসের ১১-১৩ নং আয়াতে আল্লাহকে অমান্যকারীদের পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তীদের পরিবর্তে নতুন লোকদের পৃথিবীতে দায়িত্ব দিয়েছেন, যাতে তিনি তাদের আচরণ লক্ষ্য করতে পারেন।

এ আয়াতে মানুষের আচরণের (behaviour) গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের আচরণের ভাল-মন্দের জন্যই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে এক জাতির পর অন্য জাতির উত্থান করেন, অর্থাৎ মানুষের আচরণ ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের বড় কারণ। কুরআনের অন্যান্য আয়াতে মানুষের ঈমান বা সঠিক বিশ্বাসকেও জাতির কল্যাণ অকল্যাণের কারণ বলা হয়েছে। সূরা আসরে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন, 'সময়ের সাক্ষ্য। মানুষ সব সময় ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, ভাল কাজ করেছে, একে-অপরকে সত্যের পথে এবং ধৈর্যধারণের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে।'

খিলাফতের অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রথম বলা হচ্ছে যে, মানুষ রাব্বুল আলামীন আল্লাহর খলীফা। রাব্বুল আলামীন-এর অন্যতম অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সব জীবের প্রতিপালক। তাই রাব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি হিসেবে প্রত্যেক মানুষকে অন্য সব মানুষ ও জীবের জীবিকা ও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের উল্লেখ করা যায়।

পৃথিবীর সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর। (সূরা হুদ : ৬)

আমার ইচ্ছা যে, দুনিয়াতে যারা বিস্তৃত তাদের উপর মেহেরবানী করব এবং তাদেরকে দুনিয়াতে ইমাম বানাব, দুনিয়াতে তাদেরকে আমার উত্তরাধিকারী করব এবং পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতা দান করব।' (সূরা কাসাস : ৫)

আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে আমার রিযিক পাওয়ার সুযোগ করে দেয়া বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব বিশেষ করে মুসলিম সরকারের আরো বেশী। কেননা তারা গোটা জাতির পক্ষ থেকেও দায়িত্বপ্রাপ্ত। তেমনিভাবে নির্যাতিত জনগণের নির্যাতন দূর করাও খলীফা হিসেবে সবার এবং বিশেষ করে সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, খিলাফতের নীতিই প্রধান গুরুত্বের দাবীদার। তাতে কোনো পরিবর্তন হবে না। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বা জনগণের মতামতের ভিত্তিতে কাজ করতে গেলে অবস্থাবিশেষে পরিবর্তন করা যেতে পারে, যদি তাতে শরীয়তের কোনো প্রমাণিত নীতির লংঘন না হয়।

www.pathagar.com

এ আয়াতে যে খিলাফতের কথা বলা হয়েছে তাতে অর্থনৈতিক খিলাফতের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক খিলাফতের নীতিও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। খিলাফতের অর্থনৈতিক নীতি হচ্ছে দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত জনগণের সম্মতিতে গ্রহণ করতে হবে। জাতির অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত হতে জনগণকে বাদ দেয়া যাবে না। এ যুগে তা করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা । স্বাধীন পত্র-পত্রিকাও এ ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ আয়াতের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। আল্লাহ্ পাক মানুষের আচরণ লক্ষ্য করেন। এ আচরণের মধ্যে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক আচরণও অন্তর্ভুক্ত। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের জন্য সে আল্লাহর নিকট দায়ী। মানুষকে তার অর্থনৈতিক আচরণের জন্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। মুসলিম সরকার কিভাবে আল্লাহর নিকট দায়ী, মুসলিম শাসকগণ সম্পর্কেও একই কথা। তাই মানুষ যদি আল্লাহর অনুগত হয়, তাহলে সে অবশ্যই অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী নিয়ম-নীতি অনুসরণ করবে। কোনো অর্থনৈতিক জুলুম করবে না বরং অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণের জন্য জবাবদিহি (accountability) ইসলামের বৈশিষ্ট্য, যা এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

নূহ (আ)-এর যুগের সামাজিক তাৎপর্য

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ج وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ * قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ط اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ * وَيٰقَوْمِ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ط اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ * وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ * وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ صلے اِنِّيْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ *

তখন তার কওমের কাফিরপ্রধানরা বলল : আমরা তো তোমাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না, আর আমাদের মধ্যে যারা হীন ও নীচ তারা ব্যতীত কাউকে তো তোমার আনুগত্য করতে দেখি না, এবং আমাদের উপর তোমাদের কোনো প্রাধান্য দেখি না, বরং তোমরা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি। নূহ বললেন : হে আমার জাতি! দেখ তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন তারপরও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে আমি কি তা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি? আর হে আমার জাতি! আমি তো এ জন্য তোমাদের কাছে কোনো অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র যিম্মায় রয়েছে। ঈমানদারদের তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়, তারা নিশ্চতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। বরং আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। আর হে আমার জাতি! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তাহলে আমাকে আল্লাহ হতে রেহাই দেবে কে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না? আর আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে এবং এ কথাও বলি না যে, আমি গায়েবী খবরও জানি। এ কথা বলি না যে, আমি একজন ফেরেশ্‌তা, আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত, আল্লাহ্ তাদের কোনো কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব।

(সূরা হূদ : ২৭-২৯)

www.pathagar.com

সাধারণ তাৎপর্য

উপরের কয়েকটি আয়াতে হযরত নূহ (আ)-এর জাতি তার নবুওতের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছিল এবং হযরত নূহ (আ) তার যে সব জওয়াব দিয়েছিলেন, তা আলোচনা করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ)-এর জাতির কথা ছিল যে, হযরত নূহ (আ) একজন মানুষ ব্যতীত কিছু নন এবং তাঁকে অনুসরণ করে কেবল হীন নীচ এবং স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা। সুতরাং নূহ (আ)-এর নবুওত গ্রহণযোগ্য নয়। এর জওয়াবে হযরত নূহ (আ) বলেন যে, তিনি আল্লাহর থেকে পাওয়া সুস্পষ্ট দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনি প্রকৃত সত্য ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছেন। তাই তাদের উচিত তাকে মেনে নেয়া। তিনি কেবল তাদের সত্য গ্রহণ কামনা করেন, তাদের নিকট থেকে কোন ধন-সম্পদ কামনা করেন না। তিনি অবশ্যই ফেরেশ্‌তা নন এবং আল্লাহর ভাণ্ডার তাঁর কাছে রয়েছে- এমন দাবীও তিনি করছেন না। এ সব নবী হওয়ার জন্য প্রযোজ্যও নয়। তিনি সাধারণ লোকদেরকে তাঁর নিকট থেকে দূরে সরাতে পারেন না। সাধারণ লোকেরা কোনো অপরাধ করেনি। সত্য গ্রহণ করা কোনো অপরাধ হতে পারে না। তাদের সঙ্গে তিনি খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না। তা করলে তিনি আল্লাহ পাকের নিকট কোনো জওয়াব দিতে পারবেন না।

এসব আয়াতে প্রমাণ হয় যে, নবীরা আল্লাহ থেকে ওহী পাওয়ার পূর্বেই বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য করে তাওহীদের মূল নিগূঢ় তত্ত্বের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভে সমর্থ হন। পরে আল্লাহ পাক ওহী দানে তাদেরকে ধন্য করেন। এসব আয়াতে আরো প্রমাণ হয় যে, সাধারণ লোকদের যেহেতু কোনো কায়েমী স্বার্থ থাকে না তাই তারা সহজেই সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করতে পারেন। কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং তাদের নেতৃবৃন্দ সহজে কখনো সত্যকে মেনে নিতে পারে না। এখানে আরো প্রমাণ হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থই প্রকৃত সম্পদ নয় বরং ঈমানই মূল সম্পদ, যা আল্লাহর নিকট মূল্য পাবে।

(তাফহীমুল কুরআন ও মা'আরেফুল কুরআন তাফসীরদ্বয় অবলম্বনে)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই হযরত নূহ (আ)-এর যুগের সামাজিক চিত্র তুলে ধরা যায়। হযরত নূহ (আ)-এর সময়ে সুস্পষ্টভাবে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল উচ্চবিত্ত লোকেরা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ। নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব উচ্চবিত্ত লোকদের নিকট ছিল। এ সব নেতা নিম্নবিত্তের লোকদের ঘৃণার চোখে দেখত। এদিক থেকে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা গুণগতভাবে ওহী নাযিলকালীন সময় থেকে ভিন্ন ছিল না। আজকেও বিশ্বের অনেক স্থানে একই অবস্থা বিরাজ করছে। অবশ্য আধুনিক

www.pathagar.com

যুগে অনেক স্থানে অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগের পরিবর্তে রাজনৈতিক শ্রেণী বিভাগ জন্ম নিয়েছে।

এ আয়াতসমূহে অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথাও রয়েছে। এখানে সুস্পষ্ট হয় যে, নিম্নবিত্ত সাধারণ লোক এবং ধনীদের মধ্যে আল্লাহর নিকট কোনো পার্থক্য নেই। তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে নবীকে বলা হয়নি; বরং তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হলে তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য ছিল। দারিদ্র্যের কারণেই তারা নির্যাতিত হতো। এ কারণেই ইসলামের বাণীকে তারা সহজে গ্রহণ করেছিল। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক অধিকারের বেলায়ও যথাসম্ভব সমতা রক্ষা করাই আল্লাহর পছন্দ এবং ইসলামী সরকারের তাই দায়িত্ব হবে। সব মহলের সুযোগ-সুবিধার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। অবশ্য ইসলাম যোগ্যতার নীতিকে কোথাও অস্বীকার করেনি। তাই শিল্প উদ্যোগ বা চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতার নীতিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু সাধারণ অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে ধনী-গরীব বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণী পার্থক্য করা সঙ্গত হবে না।

এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত সাধারণ লোকের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই- এ কথা বলা যায় না। এ কথার অবশ্যই ব্যাপক ধর্মীয় ও সামাজিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু এর অর্থনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। সাধারণ লোকেরাই সমাজে বেশী। তারাই সমাজের মূল জনশক্তি। এ জনশক্তির অনেক গুরুত্ব আছে। তারা কর্মী হিসেবে সমাজের অনেক কল্যাণ সাধন করতে পারে। অবশ্য তাদেরকে যথাযোগ্যভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারলে তার নিদর্শন স্পষ্ট হয়। দেশের উন্নয়ন এই জনশক্তির ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বিশ্বাসী সাধারণ জনগণ অনেক নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। তাদের সততা আর কর্মপ্রিয়তা দেশের কাজে লাগে। ইসলামী সরকারের দায়িত্ব সাধারণ জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে ব্যবহার করা। ইতিহাসেও দেখা যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগে আরবের সাধারণ লোকেরাই তৎকালীন বিশ্বকে জয় করেছিল। তারাই শাসক হিসেবে বিশ্বকে শাসন করেছিল। জ্ঞান জিজ্ঞাসা সব ধরনের অগ্রগতি সাধন করেছিল। এতে প্রমাণ হয়, ইসলামে এমন এক নৈতিক শক্তি আছে, যা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মোচিত করে। তাকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। আজও তা সম্ভব, যদি সঠিকভাবে এ শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। মু'মিনের প্রাপ্য কেবল দুনিয়াতে নয় বরং আখিরাতেও রয়েছে। আখিরাতের প্রাপ্য প্রকৃত প্রাপ্য। সুতরাং মুমিন কখনো তার কাজে কেবল দুনিয়ার প্রাপ্যকে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে সে দুনিয়াতে ক্ষতিও বরদাশত করে নেয়।

www.pathagar.com

সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা প্রসঙ্গে

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ۭ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ *

তারা বলল, হে শুআইব, তোমার নামায কি এটাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা এসব মাবুদ পরিত্যাগ করব যাদের ইবাদাত আমাদের বাপ-দাদারা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু আমরা করে থাকি তা ছেড়ে দেব? শুধু তুমিই একজন মহৎ ও সৎ ব্যক্তি থেকে গেলে। (সূরা হূদ : ৮৭)

তাফসীরকারদের আলোচনা

এ আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে মুফতী মুহাম্মদ শফী লিখেছেন : 'ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, ওরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করত । ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোনো স্থান দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন-সম্পদ যেমন খুশি ভোগ-দখল করতে পারে; এ ক্ষেত্রে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়, যেমন বর্তমান যুগেও কোনো কোনো অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

(মা'আরেফুল কুরআন, সূরা হূদের ৮৭ নং আয়াতের তাফসীর)

এ আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন, 'এটাই জুলুমের বিরুদ্ধে জাহিলিয়াতের মতাদর্শের স্পষ্ট প্রকাশ। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল, আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া যে পথ ও পন্থাই গৃহীত হবে তাই ভুল এবং তার অনুসরণ করা কিছুতেই উচিত নয়। কেননা অপর কোনো পথ ও পন্থার স্বপক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধি, বিদ্যা-বিজ্ঞান ও আসমানী কিতাবসমূহে কোনোই দলিল বা প্রমাণ নেই। আর দ্বিতীয়ত, আল্লাহর বন্দেগী শুধুমাত্র একটি সংকীর্ণ ধর্মীয় গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়- হওয়া উচিত নয়। বরং তামাদ্দুন, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির ন্যায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়িত করতে হবে। কেননা দুনিয়ার মানুষের নিকট যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। মানুষ কোনো জিনিসেরই উপর আল্লাহর মর্জি হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ইচ্ছামূলক হস্তক্ষেপ করার অধিকারী নয়।

জাহিলিয়াতের মত ও পথ এর বিপরীত। তা হল বাপ-দাদার আমল হতে যে রীতি ও পন্থা চলে এসেছে, তাই মানুষের পালন করে চলা কর্তব্য। আর তা মেনে চলার ব্যাপারে এর অতিরিক্ত অপর কোনো দলীলের প্রয়োজনই নেই যে, বাপ-দাদার নিয়ম ও পন্থা। উপরন্তু দীন ও ধর্ম বলতে শুধু পূজা-উপাসনালয়ই বোঝায়।

www.pathagar.com

জীবনের সাধারণ ব্যাপারে তো আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা যা আবশ্যক, আমরা যেখানে যা ইচ্ছা তাই করবার অধিকারী।

এ থেকে এ কথারও ধারণা করা যায় যে, জীবনকে ধর্মীয় ও বৈষয়িক এই দুই স্বতন্ত্র বৃত্তে বিভক্ত করা কোনো নতুন ধারণা নয়! আজ হতে তিন সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে হযরত শু'আইবের জাতিও এই রূপ ভাগ-বাটোয়ারা করারই দাবী জানিয়েছিল, যেমন বর্তমানের পাশ্চাত্য দেশ ও তাদের প্রাচ্য শাগরিদরা দাবী জানাচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে এটা কোনো নতুন আলো নয় এবং আজও মানসিক অবস্থা ও মননশীলতার বিকাশের ফলে জানা যাচ্ছে না। বরং আসলে এটা তো অতি পুরাতন কথা। হাজার বছর পূর্বেকার জাহিলিয়াতে এটা এরূপ প্রাপ্য সহকারে প্রচারিত হয়েছিল এবং এর বিরুদ্ধে ইসলামের প্রবল ভূমিকা সংগ্রামও পৃথিবীতে আজ নতুন নয়। বরং এও অতি প্রাচীন ব্যাপার।' (সূরা হূদের তাফসীর, ৯৭ নং টীকা)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের জন্য এটি একটি দিক-নির্দেশকারী আয়াত। এ আয়াতে স্পষ্টভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। শু'আইবের কওম মনে করত যে, তাদের কাছে যে সম্পদ রয়েছে তার নিরঙ্কুশ মালিক তারাই এবং তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ধন-সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। এ ব্যাপারে তারা কোনো ধর্মীয় আইনের বা সৃষ্টিকর্তার বিধানের অধীন নয়। নামাযের সঙ্গে বা ধর্মীয় ইবাদতের সঙ্গে অর্থনৈতিক কায়-কারবারের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে- তা তারা বুঝতেও পারত না, মানতেও চাইত না। হযরত শু'আইবকে এ জন্য তারা উপহাস করেছিল। কিন্তু কুরআন বলছে যে, আল্লাহর বিধানে এ ধরনের চিন্তার কোনো সমর্থন নেই। ইসলাম ধর্মকে এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে আলাদা ও সম্পর্ক বর্জিত মনে করে না। ইসলামের মতে, জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-নিষেধের প্রয়োগ থাকবে। জীবনকে কৃত্রিমভাবে ভাগ করা কুরআন স্বীকার করে না। আল্লাহ ও নবীর আনুগত্য, সর্বপ্রকার বিধি-নির্দেশই অমান্য করা নিঃসন্দেহে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কুরআনের সংশ্লিষ্ট কিছু আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

'হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের...।' (সূরা নিসা : ৫৯)

'বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই।' (সূরা ইউসুফ : ৪০)

'জেনে রাখ, সৃষ্টি তার (আল্লাহ্র) এবং আদেশ দেয়ার অধিকারও তারই।' (সূরা আ'রাফ : ৫৪)

www.pathagar.com

'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর।' (সূরা আ'রাফ : ৩)

'আল্লাহ যা বিধান দিয়েছেন, সে মোতাবেক যারা সঠিক বিচার করে না তারা কাফির (كافر) জালিম (ظُلم) তারা ফাসিক (فُسق)।'

(সূরা মায়িদা : ৪৩, ৪৫ ও ৪৭)

এসব আয়াতে সুস্পষ্ট হয় যে, অর্থনৈতিক জীবনও আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের অধীন হবে। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের বেলায় কোনো শর্তারোপ করা হয়নি অর্থাৎ নিঃশর্তভাবে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ব্যক্তিজীবন থেকে আরম্ভ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মেনে চলতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রযোজ্য ইসলামের বিধান মেনে চলতে বাধ্য। মুসলিম রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব জাতীয় অর্থনীতিকে ইসলামের বিধান ও লক্ষ্যের কাঠামোতে নীতি-নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন করা। বর্তমান কালে সারা বিশ্বেই ইসলামী অর্থনীতিকে সমাজ বিজ্ঞানরূপে বিশ্লেষণ করার গবেষণা চলছে। সে দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আলোচ্য আয়াতে একটি গভীরধর্মী মৌল নির্দেশনা রয়েছে। আধুনিককালের অমুসলিম অর্থনীতিবিদগণ অর্থনীতিকে দু'ভাগে ভাগ করে বিবেচনা করেন। একভাবে হলো Positive economics অর্থাৎ যা যেমন আছে Something is as it is তারই রূপ প্রদর্শন। অন্যভাবে হলো Normative economics অর্থাৎ যেমন এর থাকা বাঞ্ছনীয়- as it should be. পরবর্তী ভাগে সাধারণত কোনো সমস্যার বিশ্লেষণ করে সমাধানের সুপারিশ পরিবেশনের প্রচেষ্টা হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো মূল্যবোধ আগে থেকেই প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে ধর্তব্য থাকে। তারই প্রেক্ষিতে ভালোমন্দ বিচার করে সমাজের জন্য বা কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারণ বা বিপন্ন ইত্যাদি ব্যাপারে সুপারিশ পরিবেশন করে বিশ্লেষণকারী। আর Positive economics-এর ব্যাপারে কোনো বিষয়ে কিছু ঘটনা ঘটা বা কোনো আচরণকে উপলব্ধি করার জন্য প্রথমে একটা সম্ভাব্য কারণ চিন্তা করতে হয়। তাকে hypothesis ধরে নিয়ে তার কাঠামোতে যুক্তিবাদ দাঁড় করানো হয়। সে যুক্তিবাদ দিয়ে যদি ঘটনা বা আচরণের কারণ বিশ্বাস্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে সেই আগের ধর্তব্য কারণই তত্ত্ববাদের যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য সত্যে পরিণত হয়। কিন্তু সে গ্রহণযোগ্যতা সাময়িক। অন্য তত্ত্ববাদী ভিন্ন রকম যুক্তিবাদ দাঁড় করিয়ে গৃহীত তত্ত্বকে ভুল প্রমাণও করতে পারে। তখন পরবর্তী তত্ত্বটিই নতুন সত্যে পরিণত হবে। আগেরটি বর্জিত হবে। এমনি পদ্ধতিতে কোনো অপরিবর্তনীয় ধর্তব্য সত্যের কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তেমনি পদ্ধতি সে কারণেই কোনো অপার্থিব সত্তার দেয়া সৃষ্টি জগতের বিধানের প্রতি বিশ্বাসকেও প্রশ্নাতীত মনে করে না। তখন জ্ঞান

www.pathagar.com

ও তত্ত্ব সবকিছু ধর্মনিরপেক্ষই শুধু হয় না, দিক-নির্দেশনাহীন এবং লক্ষ্যহীন হয়। সে জন্যেই জ্ঞানকে ধ্বংসের লক্ষ্যে ও অকল্যাণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হতে থাকে।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ অর্থনীতি, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকে মানুষের অর্থনীতি-বহির্ভূত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিজ্ঞানের রূপ দিয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বর্জিত তত্ত্বজ্ঞান বা তার ব্যবহারকে মানুষের জীবনোপযোগী করার জন্য কোনোই পদ্ধতি সংস্কার করেনি। সে সংস্কার সম্ভব শুধু নৈতিক ও ইসলামী মৌল বিশ্বাস এবং বিধানের ধর্তব্যকে আর ভাব-ধারণাকে অনুশীলন ও গবেষণার অন্তর্গত করে। এগুলোকে বলা হয় Fundamental Assumptions and Concepts.'

www.pathagar.com

সৎ পথে ব্যয় প্রসঙ্গে

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ط اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ *

যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম রয়েছে। (সূরা রা'দ : ২২)

শব্দের ব্যাখ্যা

رزق অর্থ- খাদ্য, উপায়, সম্পদ, জীবনোপকরণ, বৃত্তি, পেশা, নিয়ামত, অনুগ্রহ ইত্যাদি। (আরবী-ইংরেজী অভিধান)

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী শফী (র) লিখেছেন, উর্দু ভাষায় কোনো বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবর বলে মনে করা হয়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরো ব্যাপক। কারণ এর আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া। বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। 'যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আল্লাহ্র নামেও ব্যয় করে।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না, বরং নিজেরই দেয়া রিযিকের কিছু অংশ চান। এটা দেয়ার ব্যাপারে তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়। অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সাথে سرا وعلانية শব্দ দু'টি যুক্ত হওয়ায় বোঝা যায় যে, সদকা-খয়রাত সর্বত্র গোপন করাই সুন্নত নয়, বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ।

(মা'আরেফুল কুরআন, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৮-২০৯)

আর্থ সামাজিক তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতে ব্যয়কে সৎ লোকদের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যয় সম্পর্কে এ পূর্বেও অনেক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামে ব্যয়ের প্রথম মূলনীতিই হল তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে। অবশ্য ইসলামে সব ভালো কাজই এ উদ্দেশ্যে করতে হয়। ইসলামে ব্যয়ের অন্যান্য মূলনীতি কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় ও অপচয়কে নিন্দা করেছে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে: وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ ... ...

وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

www.pathagar.com

এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না। বস্তুত যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই...। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬-২৭)

এ ব্যয় করতে হবে অতিরিক্ত সম্পদ থেকে, যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে : يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ . قُلِ الْعَفْوَ .

তারা তোমাকে কি খরচ করবে তা জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

এ ব্যয় করতে হবে আল্লাহর পথে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও তা ব্যয় করা যাবে, কেননা ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল। আত্মীয়-স্বজন এবং দরিদ্র জনগণের জন্যও ব্যয় করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করাকে মু'মিনের গুণ বলা হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ কথার ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে অর্থনৈতিক মন্দকেও আইন মোতাবেক শৃঙ্খলার মাধ্যমে দূর করতে হবে। অপরিকল্পিতভাবে তা করা যাবে না। তাহলে সমাজে ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে।

www.pathagar.com

সম্পদ বণ্টন সম্পর্কিত আল্লাহর নীতি প্রসঙ্গে

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ الْغُرُوْرُ *

আল্লাহ যাকে চান রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণ রিযিক দেন। এ লোকেরা দুনিয়ার জীবনে আনন্দে নিমগ্ন হয়ে থাকে অথচ দুনিয়ার জীবন পরকালের তুলনায় সামান্য পরিমাণ সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।

(সূরা রা'দ : ২৬)

শব্দের অর্থ

'রিযক' (رزق) এই শব্দের ব্যাপক অর্থ সূরা বাকারার ৩ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন : এ আয়াতের পটভূমি এই যে, মূসার কাফিরগণও সাধারণ মূর্খদের ন্যায় আকীদা ও আমলের ভালো-মন্দ দেখার পরিবর্তে ধনী ও দরিদ্র হওয়ার দৃষ্টিতে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা নির্ধারণ করত। তাদের ধারণা ছিল, যে লোক দুনিয়ার আরাম-আয়েশের দ্রব্যসামগ্রীর অধিকারী, সে লোক বুঝি আল্লাহরও প্রিয় কার্যত সে যতই পথভ্রষ্ট ও অনাচারী হোক না কেন। পক্ষান্তরে যার অবস্থা দীন-দরিদ্র সে আল্লাহরও অপ্রিয়, অভিশপ্ত লোক, তার আমল, আখলাক, যতই উন্নত ও পবিত্র হোক না কেন। এ কারণেই তারা কুরাইশ সম্প্রদায়কে নবী করীম (স)-এর সাহাবীদের তুলনায় অনেক মর্যাদাবান ও সম্মানী মনে করত। তারা বলত, 'এই দেখই না, আল্লাহ্ কাদের সঙ্গে রয়েছেন।' এ সম্পর্কে আল্লাহ সাবধান করে দিয়েছেন। বলেছেন, রিযিকের কম বেশী হওয়া তো আল্লাহর অপর এক নিয়মের অধীন। অপর দিক দিয়ে অসংখ্য রকমের বিবেচনার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা কাউকে বেশী, কাউকে কম দান করেন। কিন্তু মানুষের অভ্যন্তরীণ নৈতিক মানদণ্ডের জন্য এটা কোনো মানদণ্ড নয়। মানুষের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যকরণের আসল ভিত্তি এবং সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যশালী হওয়ার আসল মাপকাঠি হচ্ছে যে চিন্তা ও কর্মের সঠিক পন্থা কে গ্রহণ করেছে, কে উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হয়েছে আর কে খারাপ গুণাবলীর। কিন্তু অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা এ ভিত্তি ও মাপকাঠি বাদ দিয়ে কাকে ধন-সম্পদ বেশী দেয়া হয়েছে আর কাকে কম- তারই ভিত্তিতে বিচার করে থাকে।

www.pathagar.com

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী লিখেছেন : পৃথিবীতে বেশী সম্পদ ও অর্থ হওয়া ভালো ভাগ্য বা মন্দ ভাগ্যের ব্যাপার নির্ধারণ করে না। এটা সব সময় সত্য নয় যে, যাদের বেশী ধন-সম্পদ আছে তারা আল্লাহর অধিক প্রিয়। আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দা দারিদ্র্যে জীবন কাটায়, অন্যদিকে অনেক অপরাধী লোক আরাম-আয়েশে দুনিয়ায় থাকে। এটিই আখিরাত সংগঠন করার কারণ। সুনিশ্চিতভাবে আর একটি জগত আছে যেখানে ভালো- মন্দ কাজের ফল পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে পৃথিবীর অভাব বা প্রাচুর্য গ্রহণ বর্জনের মানদণ্ড হতে পারে না।

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সূরা রা'দ রাসূলুল্লাহ (স)-র মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। এই সূরায় নানাভাবে তাওহীদ, পরকাল ও নবুওত-রিসালাতের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এই সূরার ৩য় রুকূতে সৎ ও মন্দ লোকদের গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে। সৎ লোকদের গুণাবলী পর্যায়ে বলা হয়েছে- তারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূরণ করে, আল্লাহ যে সব সম্পর্ক বহাল রাখতে বলেছেন তা বহাল রাখে, ধৈর্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আল্লাহর দেয়া রিযিক হতে প্রকাশ্য ও গোপনে খরচ করে এবং অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা প্রতিরোধ করে। এই সব লোকের জন্য রয়েছে পরকালে বিশেষভাবে পুরস্কার। সৎ লোক দুনিয়াতে পুরস্কার পেতে পারে আবার নাও পেতে পারে। আল্লাহর নানা নিয়মে তা ঘটতে পারে। যেমন আল্লাহ পাক সূরা বাকারায় বলেছেন :

আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদিগকে। (সূরা বাকারা : ১৫৫)

দুনিয়াতে কোনো সৎ লোকের কম ধন-সম্পদ হওয়া তার আল্লাহর নিকট অপ্রিয় হওয়ার লক্ষণ নয়। তেমনিভাবে কারো বেশী ধন-সম্পদ হওয়া আল্লাহর নিকট প্রিয় হওয়ার লক্ষণ নয়- যেমন মক্কার কাফিররা বিশ্বাস করত। আজ-কালও পাশ্চাত্যের উন্নত জৌলুসে প্রভাবিত লোকেরা এ ধারণা বিশ্বাস ও প্রচার করে থাকে। এ বিশ্বাস ও যুক্তির অসারতা ঘোষণা করেই আল্লাহ পাক বলছেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন আর যাকে ইচ্ছা রিযিক কম দেন। এসব ঘটে থাকে আল্লাহর পরিকল্পনা ও নৈতিক আইনের অধীনে।

অবশ্য এখানে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রিযিক অর্জন ও ধন বণ্টন সম্পর্কিত আল্লাহর আইনের অন্যান্য দিকও রয়েছে। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার রিযিকের জন্য চেষ্টা করতে হবে। (সূরা জুমু'আ : ১০; সূরা নিসা : ৩২; সূরা হাশর : ৭)। তেমনিভাবে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমাজ ও রাষ্ট্র দেখাশুনা করবে এবং তার অভাব দূর করবে। (সূরা তওবা : ৬০; সূরা জারিয়াত)

www.pathagar.com

আলোচ্য আয়াতে ধন বন্টন সম্পর্কিত আল্লাহর একটি মৌলিক নীতি সুস্পষ্ট হয়। ইসলামের ধন বন্টন নীতি সম্পর্কিত অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ আয়াতের বক্তব্যকেও ইসলামী অর্থ ও সমাজ নীতিবিদদের মনে রাখতে হবে।

অর্থাৎ এ আয়াত থেকে একথা মোটেই বোঝায় না যে, সম্পদে মানুষের হিস্যার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে থাকেন বলে তাকে সম্পদ অর্জনের জন্য কোনো চেষ্টা তদবির করতে হবে না। কেননা এখানে উল্লিখিত বিষয়টি হলো প্রাকৃতিক ও নৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আর সম্পদ অর্জনের জন্য চেষ্টা করা সাধারণ নীতিমালার অন্তর্গত। এ দু'য়ের সমন্বয়েই ইসলামী জীবন দর্শন পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং এতেই ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিহিত।

www.pathagar.com

কালেমা তাইয়্যেবার অর্থনৈতিক তাৎপর্য

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ * تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ * يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ *

তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তাআলা কোন জিনিসের সঙ্গে কালেমায়ে তাইয়্যেবার তুলনা করেছেন। এটার দৃষ্টান্ত এই, যেন একটি ভালো জাতের গাছ যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ় নিবদ্ধ হয়ে আছে এবং শাখাগুলো আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা প্রত্যেক মওসুমে তার ফল দান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। এই সব উদাহরণ আল্লাহ এই জন্য দিয়েছেন যেন মানুষ এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর নাপাক কালেমার উদাহরণ হচ্ছে, একটি খারাপ জাতের গাছ, যা মাটির উপরিভাগ হতে উপড়ে ফেলা যায়, এর কোনো দৃঢ়তা নেই। যারা প্রতিষ্ঠিত প্রমাণিত বাক্যে বিশ্বাসী আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত- দুইখানেই প্রতিষ্ঠা দান করবেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন।

(সূরা ইবরাহীম : ২৪-২৭)

শব্দের তাৎপর্য

'কালেমা তাইয়্যেবা'র শাব্দিক অর্থ হল পাক ও পবিত্র কথা। কিন্তু এর তাৎপর্য হল সত্য কথা ও নেক নির্মল আকীদা বিশ্বাস, যা পুরাপুরি প্রকৃত সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার উপর ভিত্তিশীল হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ হলো তাওহীদের স্বীকৃতি। কেননা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব হচ্ছে আসল সত্য কথা।

(তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীমের তাফসীর)

কালেমায়ে খবীসা- এটা কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিপরীত। প্রত্যেক সত্য বিপরীত ও ভূলভিত্তিক কথা বা বিষয়কেই খবীসা কালেমা বলা চলে। এখানে এর অর্থ প্রত্যেক ভুল মতবাদ যাকে ভিত্তি করে মানুষ নিজের জীবন গড়ে তোলে। তা

www.pathagar.com

নিছক নাস্তিকতাও হতে পারে, হতে পারে শিরক-বিদ'আত বা নবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত নয় এমন মতবাদ। (প্রাগুক্ত)

কাওলে সাবিত- এর অর্থ প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণিত কথা। এখানে এর অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।' (নাসাফী, কাশশাফ)

তাফসীরকারদের আলোচনা

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি আয়াতের উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, কালেমায়ে তাইয়্যেবা হচ্ছে মহাসত্য। আসমান হতে যমীন পর্যন্ত গোটা সৃষ্টি এ মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে প্রাকৃতিক আইন ও নিয়ম কোনোদিক দিয়েই এর সঙ্গে সংঘর্ষশীল হয় না। এটি এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ কালেমা, যে ব্যক্তি বা জাতিই একে ভিত্তি করে নিজ জীবনের ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, সে সব সময় এর সুফল লাভ করবে। সে চিন্তায় পরিপূর্ণতা, স্বভাব-চরিত্র নির্মলতা, প্রকৃতিতে ভারসাম্য, নীতির দৃঢ়তা ও নৈতিক পবিত্রতা, পারস্পরিক কাজকর্মে ন্যায়পরায়ণতা, ওয়াদা, প্রতিশ্রুতিতে পরিপক্কতা, সামাজিক সুনীতি, অর্থনীতিতে ইনসাফ ও সহানুভূতি, রাজনীতিতে বিশ্বস্ততা, যুদ্ধে ন্যায্যতা, সন্ধিতে আন্তরিকতা ও চুক্তিতে নিষ্ঠা সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে 'খবীস কালেমা' বা ভুল বিশ্বাস মূল সত্যের বিপরীত। তা প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এটা কেবল তিক্ত ফলই দিতে পারে। কালেমা তাইয়্যেবা সব সময়ই একই ছিল অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা। কিন্তু খবীস কালেমা অসংখ্য। কালেমা তাইয়্যেবাকে কখনো সমূলে বিনাশ করা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে নিত্য নতুন খবীস কালেমা পয়দা হয়েছে। ইতিহাস অসংখ্য মৃত ও বিলুপ্ত খবীস কালেমাতে পূর্ণ।

কালেমা তাইয়্যেবা একটি দৃঢ়স্থায়ী দৃষ্টিকোণ দেয়। মানুষের সব সমস্যার সমাধান এ মহামন্ত্রে রয়েছে। কালের আকর্ষণ এটার ভিত্তিকে শিথিল করতে পারে না। অপরদিকে চলার পথে এটা বিভ্রান্ত হওয়া হতে রক্ষা করে। যখন দুনিয়ার জীবন অতিক্রম করে সে পরকালে পদার্পণ করে, সেখানেও তাকে কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা এবং দুঃখের সম্মুখীন হতে হয় না। (তাফহীমুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ- ৬ষ্ঠ খণ্ড)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

সূরা ইবরাহীমের এ ক'টি আয়াতে ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন, তত্ত্ব এবং নীতির মূল ভিত্তি পাওয়া যায়। কালেমা তাইয়্যেবাতে তার অন্তর্নিহিত দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। কালেমা তাইয়্যেবাতে একদিকে তাওহীদের অর্থাৎ এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে আল্লাহর সর্বশেষ বিশুদ্ধ বিধানের নির্দেশ মানব জাতির জন্য ঘোষণা করা হয়েছে। এই সব

www.pathagar.com

আয়াতে বলা হয়েছে যে, একটি সঠিক বিশ্বাসই ভালো ফল দিতে পারে। মন্দ বিশ্বাস থেকে কোনো ভালো ফল আশা করা যায় না। কাজেই যথার্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য একটি যথার্থ বিশ্বাসের ভিত্তিমূল প্রয়োজন। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সে বিশ্বাস হচ্ছে তাওহীদ। তাওহীদের উপর আল-কুরআনের মতে কেবল অর্থনীতির নয়, গোটা জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। তাতেই সমাজ জীবনে কল্যাণ অর্জিত হবে।

উপরোক্ত সাধারণ উক্তি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে, ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে সংগঠিত করা হলে তার স্বরূপ কেন প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ভিন্নধর্মী হবে, তারই মৌল সত্যটির দিকে আয়াতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কালক্রমে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান সন্ধানের জন্য নতুন নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। সে সকল তত্ত্বের যুক্তিবাদকে নির্ভর করে নীতি-নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন সাহায্যে নানা ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যবস্থাকেও সংগঠন করা হয়। অর্থনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও তা করা সম্ভব। এসব ব্যাপারে গবেষক ও তত্ত্ববিদগণ একটি সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য একটি রূপকে তাদের নিজস্ব জ্ঞানলব্ধ যুক্তির সাহায্যে প্রাথমিকভাবে ধরে নেন এবং তাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরিধিতে প্রয়োগ করে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হন। প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে অন্য সম্ভাব্য বিকল্পকে ধরে আবার নতুন প্রয়াস শুরু করেন। কিন্তু অর্থনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রয়াসে প্রমাণের সাফল্য ঠিক বৈজ্ঞানিকভাবে পূর্ণ ও সঠিক না হওয়ারই কথা। তার কারণ, মানুষের আচরণ ও সমাজের অসংখ্য জটিলতার কাঠামোতে আচরণের নানা সংঘাত সম্পর্ককে তথ্যের আকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পদ্ধতিই ত্রুটিহীনভাবে গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি। সমাজ ও মানুষের আচরণ যত বেশী আধুনিকতাধীন চাপে পড়ছে তত বেশি বাড়ছে প্রভাব বিস্তারকারী variable factor । সুতরাং ততই বেশী বাড়ছে সামাজিক সমস্যা সমাধান ক্ষেত্রে তত্ত্ববাদকে নির্ভুল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা সংশয়। আংশিক প্রয়োগে আংশিক ফল পাওয়ার তথ্য সাহায্যেই কেউ কেউ পেতে চান নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনকারীর গৌরব। অথচ সে আংশিক নতুন তত্ত্ববাদ আংশিকভাবে স্বল্পকালের জন্য সুফল দিতে পারলেও কালক্রমে সেটুকু সুফল লাভের ভিত্তিটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নতুন প্রেক্ষিতে নতুন পরিস্থিতি একই পূর্ববর্তী সুফলদায়ক তত্ত্ববাদ অসামাজিক অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে। আদম স্মিথ- রিকার্ডো সৃষ্ট ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির তেমনি হয়েছে অবসান, ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি ব্যবস্থার কুফলকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মার্কসবাদেরও হয়েছে অবসান। বর্তমান পৃথিবীতে কল্যাণের সন্ধান করছে পাশ্চাত্য, কল্যাণ রাষ্ট্রের নতুন রূপের অর্থনীতি এবং একই কল্যাণের সন্ধান করছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নানা

www.pathagar.com

মাত্রার সমাজতন্ত্রবাদ। এখনো সে সকল সন্ধান অনুসন্ধান ও নতুন তত্ত্ববাদের বাস্তবায়ন সঠিক সুগঠিত রূপ নিয়ে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সৃষ্টির উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়নি। তা হতেও পারবে না কোনদিন। কারণ, ভিত্তিগত ধর্তব্য সত্য বা axiom চিন্তা ও অনুশীলন সম্পর্কেই রয়েছে গোড়ায় গলদ।

আলোচ্য আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামী তত্ত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমেই স্বীকৃতি দান করতে হবে ইসলামী ধর্তব্য axiom-কে। প্রথম মৌল axiom-ই হলো 'তাওহীদ' জ্ঞান। এ জ্ঞানের স্বীকৃতি থেকেই আসছে ধর্তব্যের দৃঢ় স্তম্ভ, যার সত্যতার পরিবর্তন হবে না। সে জন্যেই এ ধরনের সত্যতাকে ভিত্তি করে যে সব variable-কে প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করতে হয় তার সংখ্যাও সীমিত। সে সব সীমিত variable-কে কঠোর সত্যনিষ্ঠ পদ্ধতিতে যুক্তি ও আল-কুরআন সুন্নাহর সমর্থন সম্পর্কের মূল্যায়ন সহজ পন্থায় আর সঠিক পন্থায় পরিচালনা করা সম্ভবপর। আর এসব গবেষণা ও তত্ত্ববাদ সংগঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে অসত্য ও অকল্যাণের নির্দেশক তত্ত্ব এবং নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার ঝুঁকি থাকে খুবই কম। সে ঝুঁকি মানুষের উল্লিখিত সঠিক পদ্ধতিকে আয়ত্ত করার এবং প্রয়োগ করার দক্ষতার সীমাবদ্ধতার ওপরই নির্ভরশীল। সে কারণে বর্তমান বিশ্বেও পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে সর্বাঙ্গীন উপযোগী ইসলামী অর্থনীতি সমাজনীতি ব্যবস্থা সংগঠনের তত্ত্ববাদ ও নীতি-নির্ধারণকে প্রতিষ্ঠিত রূপ দিতে পারলে দেখা যাবে, পরিবর্তনশীল পুঁজিবাদ ও পরিবর্তনশীল সমাজতন্ত্রবাদের চেয়ে সঠিক ভিত্তির ভারসাম্যপূর্ণ শোষণহীন সুবিচারমূলক ইসলামী ব্যবস্থাই বিশ্বের মানুষের জন্য সর্বত্রই সর্বোচ্চ কল্যাণপ্রসূ।

www.pathagar.com

আল্লাহর নিয়ামতের অপরিমেয়তা প্রসঙ্গে

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۭ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۭ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ *

তিনি তোমাদেরকে সে সব কিছুই দিয়েছেন, যা তোমরা তাঁর নিকট চেয়েছ। তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ বড়ই অবিচারক ও অকৃতজ্ঞ।

(সূরা ইবরাহীম : ৩৪)

শব্দের অর্থ

নিয়ামত (نعمت) অর্থ দান, অনুগ্রহ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পদ ইত্যাদি। (আরবী-ইংরেজি অভিধান)

তাফসীরকারদের আলোচনা

মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী তার তাফসীরে লিখেছেন :

'আল্লাহ মানুষ যা জিহবা দিয়ে চেয়েছে তা তাকে দান করেছেন। মানুষ যা কিছু আবিষ্কার করেছে, তা আল্লাহ পাকই দান করেছেন। কেননা মানুষের প্রগতির জন্য এসব প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আল্লাহ পাক এসব নতুন নতুন চাহিদা পূর্ণ করেছেন।

(তাফসীরে উসমানী, সূরা ইবরাহীম, ৫৯ নং টীকা)

আল্লাহ্ পাকের নিয়ামতের সংখ্যা এত অধিক ও অসংখ্য যে, গোটা মানব জাতিও একত্র হয়ে তা গণনা করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাযী বলেছেন, 'আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য এবং আল্লামা আবূ সউদ বলেন যে, এসব নিয়ামতের পরিমাণ সীমাহীন।'

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী 'তিনি তোমাদেরকে সে সব কিছুই দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছ' এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

অর্থাৎ স্বভাব ও প্রকৃতির প্রত্যেকটি দাবীকেই পূর্ণ করেছেন। তোমাদের জীবনের জন্য যা যা প্রয়োজনীয়, তা তিনি যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। তোমাদের স্থিতি ও বিকাশ লাভের জন্য যে সব উপাদান অপরিহার্য সবকিছুই তিনি লাভ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীমের ৪৫ নং টীকা)

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

সূরা ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবনের শেষ ভাগে অবতীর্ণ হয়। এ সূরায় রাসূল ও ইসলামের দুশমনদেরকে তাদের পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত সূরা ইবরাহীমের পঞ্চম রুকূর অংশ এবং এ রুকূ শুরু হয়েছে 'আল্লাহর দেয়া নিয়ামত অস্বীকারকারীদের পরিণতি'র বর্ণনা দ্বারা। অতঃপর আল্লাহ পাক নিয়ামতসমূহের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন এবং তার মাধ্যমে মানব জাতিকে রিযিক দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি নানা আকারের ফল সৃষ্টি করেছেন। নদ-নদী ও নৌযানকে মানুষের অধীন করেছেন, সূর্য-চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন মানুষের কল্যাণে। ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে, যা মানুষ গণনা করেও এসবের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না।

আল্লাহর উপরোক্ত ঘোষণার আলোকে দেখা যায়, আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য ও সীমাহীন। নিয়ামত অবশ্য কেবল সম্পদ (resource) অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না। সম্পদও নিয়ামতের অংশ। এ প্রেক্ষিতে সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। কেননা আমরা জানি না যে, বিশ্বে এবং সৌরমন্ডলে কি সম্পদ ছড়িয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে এসব সম্পদ অনুসন্ধান করা এবং তা পাওয়া গেলে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইসলাম বাস্তবসম্মত আচরণ শিক্ষা দিয়েছে। রাসূলের গোটা জীবনই তার প্রমাণ। এ জন্য অর্থনীতিবিদ ও সম্পদকে অচল জানা ও আবিষ্কৃত সম্পদের ভিত্তিতেই পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত জুলুম ও অকৃতজ্ঞতার কথা এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষকে এত সম্পদ ও নিয়ামত দান করা সত্ত্বেও মানুষ এসবকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক সুবিচার ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসে না। সে জন্য দেখা যায় যে, সৃষ্টিগতভাবে সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সামাজিকভাবে বহু লোক আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। আদেল ও শাকুর হিসেবে মানুষ তার দায়িত্ব পালন করলে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হতো না।

www.pathagar.com

জন্তু-জানোয়ারের উপকার প্রসঙ্গে

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ط إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ *

তিনি তোমাদের জন্য জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করেছেন। তাতে তোমাদের জন্য খাদ্য ও পোশাক রয়েছে। নানাবিধ অন্যান্য উপকারও এতে রয়েছে। তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য রয়েছে, যখন সকাল বেলা তোমরা সেগুলোকে বিচরণের জন্য পাঠাও এবং যখন সন্ধ্যায় সেগুলোকে ফিরিয়ে আন সেগুলো তোমাদের ভার-বোঝা বহন করে এমন স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায় যেখানে তোমরা খুব কঠোর শ্রম ছাড়া পৌঁছতে পার না। আল্লাহই বড় অনুগ্রহসম্পন্ন ও মেহেরবান। তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গর্দভ পয়দা করেছেন যার উপর তোমরা সওয়ার হও এবং তোমাদের জীবনে উজ্জ্বল হয়। তিনি আরো বহু জিনিস তোমাদের কল্যাণে পয়দা করেন। যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুজানা নেই। (সূরা নাহল : ৫-৮)

আয়াতসমূহের সাধারণ তাৎপর্য

সূরা নাহলের শুরু হতে তাওহীদের প্রমাণ পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মহান পবিত্র এবং শিরক হতে মুক্ত। তিনি যাকে চান নবী বানান এবং তার নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করেন। এ বাণীসহ যে, 'তোমরা সকল লোককে সাবধান ও সতর্ক কর এবং কেবল আল্লাহকেই মান্য কর।' আল্লাহ্ পাক আসমান যমীনকে সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে ক্রমে সামান্য ফোঁটা হতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর অমান্যকারী হওয়া সাজে না।

এরপর জন্তু-জানোয়ারের এবং তার মধ্যে মানুষের জন্য যে উপকার রয়েছে তার আলোচনা (আয়াত ৫-৮)-এ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক জন্তু-জানোয়ার পয়দা করেছেন। তার মধ্যে মানুষের জন্য রয়েছে পোশাক ও খাদ্য। জন্তুর মধ্যে আরো নানাবিধ ফায়দা নিহিত রয়েছে। অনেক জন্তু ভার বহন করে থাকে, অনেক জন্তু দুর্গম স্থানে যাতায়াতে সহায়তা করে। অনেক জন্তুর সৌন্দর্যও মানুষকে

www.pathagar.com

মোহিত করে। আলোচ্য আয়াতসমূহের পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক তাওহীদের আরো প্রমাণাদি উল্লেখ করেছেন। তিনি আকাশমন্ডল হতে বৃষ্টি বর্ষণ করান, যার দ্বারা মানুষ পানি পান করে তৃপ্ত হয়। এ বৃষ্টির সাহায্যে যে ফসল, তৃণ হয় তার দ্বারা মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার খাদ্য পায়। তিনি যে নানা রকম ফসল উৎপাদন করেন, সূর্য ও চন্দ্রকে যেভাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন, যেভাবে তিনি নদী-সমুদ্রকে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং যেভাবে তিনি পর্বতসমূহ পৃথবীর বুকে স্থাপন করেছেন তাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। মানুষ এসবের মধ্যে এক মহাপরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনা লক্ষ্য করে সেই পরিকল্পনাকারী স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আয়াত ক'টিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মানুষের উপকারী জন্তুগুলোর অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। প্রথমেই লক্ষণীয়, আল্লাহর সৃষ্টি কতকগুলো জন্তু থেকে মানুষের জীবনধারণ ও জীবনের ক্রমাগত উন্নতির অবলম্বন উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। খাদ্য হিসেবে পাওয়া যায় সুস্বাদু গোশত আর দুগ্ধ। পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরীর উপকরণ হিসেবে পাওয়া যায় জন্তুর গায়ের পশম। জন্তুর চর্ম থেকে তৈরী হয় শৈত্যের পোশাক, পানি বহন করার মশক আর তাঁবু তৈরী করার ভিন্ন ভিন্ন অংশ। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশে যান্ত্রিক যুগের পূর্বে প্রকৃতির সঙ্গেই তার ছিল নিকট সম্পর্ক। মানুষ বন্য পশুকে বশ করেছে এবং তার জীবনের সাহায্যকারী হিসেবে লালন-পালন করেছে। বন্য অশ্ব, বন্য গবাদি পশু, মেষ, হরিণ ইত্যাদি আহরণ করে অর্থনৈতিক কাজে সাহায্য করার সম্পদে পরিণত করেছে। যে অঞ্চলে এসব উপকারী জন্তুর উপযোগী বন-জঙ্গল ও পরিবেশ সৃষ্টি ছিল, সে অঞ্চলেই কৃষি খামারের উন্নয়নের সঙ্গে পশু পালন ও তার উন্নয়ন কাজ প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের আয়ত্ত হয়েছে। বিশেষ করে বনবহুল ও জনবিরল ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোতে এমনি বিবর্তন সহজ আর ফলপ্রসূ হয়েছে। উৎপাদনশীলতার বর্তমানকালেও উৎকর্ষ ফলপ্রসূতার ভিন্ন প্রাকৃতিক ভিত্তিকে অবলম্বন করে প্রতিযোগিতাশীল সমৃদ্ধি অর্জন করা যায়। খামার ও পশু পালনের উন্নত উৎপাদন তাই বর্তমান বিশ্বেও অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, হল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলের দুগ্ধ, মাখন ও ঘি জাতীয় খাদ্য পৃথিবীর সর্বত্রই বাজার লাভ করছে।

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করেই জন্তু ছিল মানুষের এবং নানা প্রকার ধন-সম্পদ স্থানান্তর করার নিরাপদ অবলম্বন। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের প্রগতি ও প্রসার ধন-সম্পদের স্থানান্তর ও দূর-দূরান্তে বিনিময় করার ওপর এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার ওপর নির্ভরশীল। হাতী, উট, অশ্ব, মহিষ, বলদ

www.pathagar.com

ইত্যাদিই সে কাজে মানুষকে দিয়েছে সাফল্য ও সমৃদ্ধি। বর্তমানকালেও যে সব ব্যাপক অঞ্চলে যান্ত্রিক যানবাহন বা জলপথের প্রাধান্য নেই, সে সব অঞ্চলে সব দেশেই পশু বহন করে অথবা পশু যানবাহন টেনে নেয়। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের বিরাট অংশের পরিবহণ কাজ করছে পশু। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক যোগাযোগ সৃষ্টি পশুচালিত যানবাহনে চলছে। এই হলো অর্থনীতির অবকাঠামো প্রকৃতির অবদান।

তৃতীয়ত, প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই নিযুক্ত রয়েছে পশু, গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র। বলদ ও মহিষই এ ক্ষেত্রে পুঁজিযন্ত্রের মতো সাহায্য করছে- কৃষির খামারে মাটি তৈরী কাজে, লাঙ্গল, মই টানা কাজে, সেচের পানি উত্তোলনে, শষ্য মাড়াই কাজে। সুস্থ বলিষ্ঠ বলদ ও মহিষ না থাকলে কৃষিকাজে এমনি পশু প্রয়োগের ভূমিকাও হয় দুর্বল, ফসলের উৎপাদন হয় কম, চাষীর অর্থনৈতিক অবস্থাতে আসে দুর্ভাগ্য। সুতরাং পশুর খাদ্য ও পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থাও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই মানুষকে করতে হয়।

চতুর্থত, কৃষি খামার, বনজ সম্পদ ও পশুপালনের পরিবেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যেমন পরিকল্পনা আল্লাহর সৃষ্ট আইনেরই অন্তর্গত, তেমনি আবার এ পরিবেশের মানবিক জীবনে কতকগুলো বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এ পরিবেশে প্রকৃতির আকাশ-বাতাস, ফুল-ফল, পাখির কাকলি মানুষের মনকে দেয় বিশুদ্ধতা আর বিশুদ্ধ আনন্দ। অন্যদিকে প্রত্যক্ষভাবে পশুপালনের কাজের মধ্যেও মানুষ পায় শিল্পীর সৌন্দর্যবোধ- পশুর দলকে প্রত্যুষে মাঠের দিকে পরিচালনা করার সময়ে আবার সন্ধ্যার ছায়াঘেরা স্নিগ্ধতায় পশুর দলকে ফিরে আনার সময়ে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের এবং জীবিকা আহরণের সংগ্রামের মধ্যেই সরল সুন্দর সততার অনুরূপ গ্রামবাসীর মনে জাগে শিল্পীর তৃপ্তি এবং তার নিজের হাতের সৃষ্টির মাধুর্য।

www.pathagar.com

সম্পদের ব্যয় প্রসঙ্গে

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا * اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا * وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا *

নিজেদের হাত গলার সঙ্গে বেঁধে রেখো না এবং একে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিও না, তা করলে তোমরা নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। তোমার রব যার জন্য চান রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য চান সঙ্কীর্ণ করে দেন। তিনি তার বান্দাদের সবার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন এবং তাদেরকে দেখছেন। আর তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমরা তাদেরকে রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা একটি বিরাট অপরাধ।

(সূরা বনী ইসরাইল : ২৯-৩১)

আয়াতসমূহের সাধারণ তাৎপর্য

উপরোক্ত আয়াতসমূহে প্রথমত খরচের ব্যাপারে মধ্যমপন্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এমন কৃপণ হওয়া সঙ্গত নয় যে, সে প্রয়োজনীয় খরচও করে না- তা তার নিজের জন্য হোক বা অন্যের জন্য অথবা পরিবারের জন্য। কৃপণতা ধন-সম্পদের আবর্তন ব্যাহত করে এবং অপচয় ব্যক্তির অর্থনৈতিক ক্ষমতা নষ্ট করে। তারপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে রিযিক বিতরণের ব্যাপারে কম বেশীর পার্থক্য করেছেন। অবশ্য এ অসাম্য আল্লাহর নিয়মের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তারপর বলা হয়েছে, দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা যাবে না। সন্তানের রিযিক তেমনি আল্লাহ দেন যেমনি দেন তাদের পিতা-মাতার রিযিক। সন্তান হত্যা করা একটি বড় অপরাধ।

এ নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা চিরতরে সন্তান হত্যার রেওয়াজ বন্ধ করে দিয়েছেন। অভাবের ভয়ে হোক বা অন্য কারণে হোক। প্রকৃতপক্ষে আইনসঙ্গত কারণ ছাড়া সব হত্যাই নিষিদ্ধ বা হারাম।

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী এ সব আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন : 'হাত বাঁধা' একটি রূপক কথা। তা হতে বোঝায় কার্পণ্য। যার হাত খোলা, ছেড়ে দেয়ার

www.pathagar.com

অর্থ অপচয় বেহুদা খরচ করা। লোকদের মধ্যে যতদূর মধ্যম নীতিবোধ থাকা আবশ্যক যে, তারা না কৃপণ হয়ে ধন-সম্পদের আবর্তনকে ব্যাহত করবে, আর না অপচয় ও অপব্যবহারকারী হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তিকে বিনষ্ট করবে। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন এক নির্ভুল অনুভূতি বর্তমান থাকবে যে, তারা প্রয়োজনীয় খরচ হতে বিরতও থাকবে না এবং বেহুদা খরচের বিপর্যয়েও তারা নিমজ্জিত হবে না। অহঙ্কার, রিয়া ও লোক দেখানোর জন্য আয়-ব্যয় বিলাসিতা ও পাপ কাজে অর্থ ব্যয় আল্লাহর নিয়মের প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা। যেসব লোক নিজের ধন-দৌলত এ সব পথে ব্যয় করে তারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের ভাই।'

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে রিযিক বিতরণের ব্যাপারে যে কম বেশীর পার্থক্য রেখেছেন মানুষ তার কল্যাণকারিতা বুঝতে পারে না। এ বাক্যটি দ্বারা যে স্বাভাবিক নিয়মের দিকে অঙ্গুলি সংকেত রাখা হয়েছে তার দরুন মদীনার সমাজে সংশোধনমূলক কর্মসূচীতে এই কথা মনে করার কোনো কারণই কখনও দেখা দেয়নি যে, রিযিক উপার্জনের উপায় উপাদানে কম-বেশী হওয়া মূলতই খারাপ জিনিস। কাজেই এটাকে নির্মূল করা এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা কোনো অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না। পক্ষান্তরে মদীনা শরীফে মানবীয় সমাজকে সুস্থ ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্য যে কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা ছিল এই যে, আল্লাহর সম্মত নীতি মানব সাধারণের মধ্যে যে পার্থক্য রেখেছে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হবে এবং পূর্বোক্ত হেদায়াত অনুযায়ী সমাজের নৈতিকতা, চাল-চলন ও কর্মনীতির এমন সংশোধন করে দিতে হবে যে, অর্থ-সম্পদের পরিমাণ পার্থক্য যেন কোনোরূপ জুলুম, বে-ইনসাফীর কারণ হয়ে না দাঁড়াতে পারে।

(তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈলের ২৯ ও ৩০ নং নোট হতে উদ্ধৃত)

মুফতী মুহাম্মদ শফী ৩০ নং আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন :

'জাহিলিয়াতের যুগে কেউ কেউ জন্মের পর পরই সন্তানদের বিশেষ করে কন্যাদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এ কর্মপন্থাটি যে জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদাতা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহর কাজ। তোমাদেরকে তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছো।

(মা'আরেফুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১ নং আয়াতের তাফসীর)

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

প্রথম দু'টি আয়াতে (২৯ এবং ৩০ নং) রিযিক এবং তা থেকে ব্যয় সম্পর্কিত নীতির প্রতি দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরার পূর্ববর্তী অন্য দু'টি (২৬ ও ২৭) আয়াতের সঙ্গেও উক্ত নীতি বিশ্লেষণের সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া মৌলভাবে সূরা বাকারার ২ নং আয়াতে যে মু'মিনের চরিত্র বিশেষত্ব বোঝাবার প্রেক্ষিতে رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ বলা হয়েছে তার সঙ্গেও যথেষ্ট বিশ্লেষণ প্রেক্ষিতে সম্পর্ক লক্ষণীয় (এ সম্পর্কে সূরা বাকারার উল্লিখিত ২ নং আয়াত নিয়ে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

ব্যয়নীতি নির্ধারণে ইসলামী অর্থনীতির জন্য ধর্তব্য কাঠামো হলো প্রধানত তিনটি :

১. ইসলামী ঈমানে প্রতিষ্ঠিত মানুষের জীবনধারা ও আধ্যাত্মিক আচরণ-শৃঙ্খলার বিদ্যমানতা (সালাত, যাকাত ও রিযিকের সমন্বয় সাধন যার জন্য সম্ভব); ২. আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের অধীনে উৎপাদন, বিতরণ ও জীবন যাপন ব্যবস্থার সংগঠন (যাকাত, সাদাকাত, সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য অনুসরণ এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত ব্যয় বর্জন যাতে সম্ভব হয়); এবং ৩. রিযিক, আয়-উপার্জন ও সম্পদের সঙ্গে সমন্বিতভাবে ব্যয়নীতিতে ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা (যার ফলে বাঞ্ছনীয় মাত্রার তুলনায় অল্প ব্যয়ে কার্পণ্যের আচরণ সমর্থিত না হয় এবং অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে অপব্যয় ও ভ্রান্তিমূলক সম্পদ বিনাশ দেশ ও অর্থনীতির ক্ষতি সাধন করে)।

উপরোক্ত কাঠামোর যুক্তিতে আমরা বিশেষ করে অনুধাবন করতে পারি একটি মৌল কথা : ইসলামী জীবনদর্শনের অন্তর্গত হলো ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং সে নীতিমালা কাঠামোর শৃঙ্খলার অধীনে ক্রিয়াশীল হলো অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া (উদ্যোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা, বিতরণ ও ভোগ ব্যবস্থা, সম্পদ ও আয়-উপার্জনের ব্যয় ব্যবস্থা)। অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকে যথাযথভাবে পরিচালিত না করলে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে ব্যয়নীতিকে কোনো যুক্তিবাদ দিয়ে মানবতার দিক থেকে ও সামগ্রিক কল্যাণের দিক থেকে পরিচালনা করা অবাস্তব প্রয়াস। সে কথা স্মরণ রেখেই এখানে ব্যয়নীতি সম্পর্কে লক্ষণীয় হলো : ১. অমিতাচারী, অতিব্যয়ী ও অপচয়কারী (সর্বক্ষেত্রে সর্ব ব্যাপারে) প্রকৃতপক্ষে কল্যাণ বিরোধী তাই শয়তানের ভাই; (আয়াত নং-২৭) এবং ২. ব্যয়ের হাতকে যে বেঁধে রাখে অথবা দিগন্ত প্রসারিত করে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক আচরণ নিন্দনীয় আর দৈন্য সৃষ্টিকারী (আয়াত নং-১৯) একটা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুস্থতা ও সচ্ছলতা এবং তার কারণে মানুষের কর্মসংস্থান, আয়-উপার্জন ক্ষমতা, উৎপাদনের ও পণ্য সরবরাহের সন্তোষজনক অবস্থা, সাধারণ দ্রব্যমূল্য হার, সকল স্তরের মানুষের

www.pathagar.com

জীবন ধারণের স্থিতিশীলতা ইত্যাদি বহুবিধ পরিণতি নির্ভর করে আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে আল্লাহ নির্দেশিত বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় ভোগ্য পণ্য, পুঁজিদ্রব্য (যন্ত্র ইত্যাদি রূপে রূপান্তরিত করার ওপর, সে সবের বিতরণ ব্যবস্থাকে ন্যায় বিচার ভিত্তিক করার উপর যাতে আয়-উপার্জন হিসেবে সঙ্কীর্ণ তাৎপর্য রিযিক লাভ ও মানুষের জন্য ন্যায়ভিত্তিক হয় এবং সে রিযিক থেকে নিজের জন্য, পরিবারের সদস্যদের জন্য, প্রতিবেশী অভাবগ্রস্তদের জন্য, এমনকি অপরিচিত অভাবগ্রস্ত পথিকের বিশেষ অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ এভাবে সম্পদের ও আয়ের বন্টন দিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণকে সার্বিকভাবে ন্যায় বিচারভিত্তিক করা সম্ভব হয়।

অর্থনৈতিক সামগ্রিক পদ্ধতিতে (Macro analysis) বা সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে কেইন্সীয় তত্ত্ববাদ প্রয়োগ করে বর্তমানকালে দেখানো হয়, সম্পদের বৃত্তাকার ঘূর্ণন (circular flow) সাহায্যে উপার্জিত আয় থেকে আসে দু'টি প্রক্রিয়া : ১. ব্যয় মাধ্যমে ভোগ এবং ২. সঞ্চয় (এবং সঞ্চয় থেকে আসে পুঁজি বিনিয়োগ (investment) আর পুঁজি সংগঠন (capital formation) । এখানেই ভারসাম্য (equilibrium) রক্ষার প্রয়োজন আছে। অর্জিত আয় থেকে সামান্য ব্যয় করে কৃপণের মতো বাঁচার জীবন যাপনকে দেশের মানুষ যদি অধিকাংশই গ্রহণ করে এবং অব্যবহৃত আয়কে স্বর্ণ-রৌপ্যের আকারে লুকিয়ে রেখেই তৃপ্তি লাভ করে, তা হলে সামগ্রিকভাবে এ পদ্ধতি সমাজের সকল মানুষের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সৃষ্টি করবে না। কারণ অব্যবহৃত গচ্ছিত গোপন আয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতে পুঁজি বিনিয়োগ এবং পুঁজি সংগঠনে সাহায্য করছে না। ফলে পূর্বেকার বিদ্যমান পুঁজি সংগঠন থেকে সামান্য পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ চলতে থাকবে এবং কালক্রমে সে ধারাটিও ধীরে ধীরে মরুপথে ক্ষীণ স্রোতস্বিনীর মতো শুষ্ক হয়ে যাবে। দেশের অর্থনীতিই ভয়ংকর পণ্য দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে পড়ে যাবে। তেমনি আবার আয়ের সব অংশই যদি মানুষ ভোগ্য পণ্য ও সেবা ক্রয় এবং ভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলে, উদ্বৃত্ত না রাখে, সঞ্চয় না করে, পুঁজি সংগঠনে এবং নতুন পণ্য উৎপাদন আর বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থার সংরক্ষণও না করে, সে ক্ষেত্রেও একই শোচনীয় পরিণতি আসবে। অর্থনীতির অবনতি মানুষকে দুর্ভোগ ও দুর্দশায় নিক্ষেপ করবে। সে জন্যই আল-কুরআন ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতি আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য নীতির ওপর জোর দিয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট মানব কল্যাণের ব্যবস্থাপনা রক্ষার উদ্দেশ্যে। তার জন্য ব্যক্তিগত আচরণ থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উপরোক্ত ভারসাম্য নীতির বাস্তবায়নকে সুনিশ্চিত করেছে।

www.pathagar.com

এমনি ভারসাম্য নীতির বাস্তবায়নকে সুনিশ্চিত করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যে সকল মানুষ নিজস্ব ভ্রান্ত চেতনার অহংকার ভারসাম্যের পথ বর্জন করে, তাদেরকে ইসলামী জীবন দর্শনের আদর্শবাদের যুক্তিতে সতর্ক করে দিলেও দুর্ভোগ-দুর্দশার পরিণতি ঘাড়ে এসে পড়ার আগে তারা আত্মবিশ্লেষণ করে না, অনুসৃত ভ্রান্ত নীতির মূল্যায়নও করে না আর নীতির যথাযথ সংশোধন বা সংস্কারও করে না। আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ববোধের ব্যবহার করে না বলেই তা করে না।

সে জন্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে (৩০ নং আয়াতে), রিযিক তো প্রচুর পরিমাণে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা তার সকল বান্দার জন্য। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে পৃথিবীর অভ্যন্তরে, আকাশে বাতাসে অর্থাৎ সারা বিশ্ব সৃষ্টিতে। সে ব্যাপক পরিধির আল্লাহ প্রদত্ত দান বা উপাদান-উপকরণকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির সমন্বিত ও ভারসাম্যমূলক ব্যবহার সাহায্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং যথাযথ মানব কল্যাণে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা বান্দাদেরই দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলেই অকল্যাণ সৃষ্টির পাপচক্রের হয় আবির্ভাব। যুদ্ধ-বিগ্রহ, উপনিবেশবাদ আক্রমণ, অত্যাচার, রাষ্ট্র ও প্রকৃত সমাজের ভাঙা-গড়া, ভারসাম্যমূলক ও ন্যায়নীতি-ভিত্তিক রিযিক বা উপাদান-উপকরণের ব্যবস্থার হয় আমূল পরিবর্তন। তার প্রেক্ষিতে অর্থনীতিতে আসে বৈষম্য, শোষণ, অবিচার, মৌল সম্পদের দৈন্য, ব্যবস্থাপনার দৈন্য, উৎপন্ন দ্রব্যের (পুঁজি দ্রব্য ও ভোগ্য পণ্য দু'ই) দৈন্য, কর্মসংস্থানের স্বল্পতা ও আয়-উপার্জনের সংকীর্ণতা। তারই ফলে সৃষ্টি হয় ধনী দেশ ও দরিদ্র দেশ, উন্নত দেশ ও অনুন্নত দেশ এবং উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের মতো উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র দেশ আর অর্থনীতি। শেষোক্ত দেশ ও অর্থনীতির জন্য সৃষ্টি হয় বিপুল অভিশাপরূপী দৈন্য আর বেকারত্ব। সকল বান্দার জন্য প্রদত্ত সম্পদের ভিত্তিগত পরিস্থিতিতে ন্যায়সঙ্গত অবস্থান এ সকল দেশে এখন আর নেই। শোষক মানুষের অবিচার ও অন্যায় আচরণ এর অন্যায় নীতি অনুসরণের জন্যই নেই। এমনি অমানবিকভাবে সৃষ্ট ভারসাম্যহীন দেশ ও সমাজের পরিস্থিতিতে বর্তমানকালে দৈন্য ও বেকারত্বের কাঠামোতে কিভাবে জনসংখ্যা সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ইসলামী বিধানকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে তাই হলো পরবর্তী ৩১ নং আয়াতের বিশ্লেষণের প্রধান তাৎপর্য।

প্রথমত, এ প্রসঙ্গে নীতিগতভাবে এ কথা বলা চলে যে, মানুষের আয়-উপার্জনের যে স্বাভাবিক অসাম্য বিদ্যমান (মানুষের স্বাভাবিক গুণাগুণ, দক্ষতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োগ কারণে) তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ শুভ, তাকে কৃত্রিমভাবে সমান করে দেয়ার নীতি ইসলামী রাষ্ট্রে ও সমাজের বিবেচ্য নয়। কট্টরপন্থী সমাজতন্ত্রবাদ সেদিকে চেষ্টা করে অকল্যাণ সৃষ্টিই প্রত্যক্ষ করেছে এবং সে পন্থা পরিত্যাগ করেছে- যেমন সোভিয়েত রাশিয়ার ও চীন দেশের সাম্প্রতিক

www.pathagar.com

আমূল পরিবর্তিত নীতিতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট (অতীতের শোষণ ও অবিচারের জন্য) অসাম্য ও দারিদ্র্য দূর করার ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

আল্লাহ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সেই জাতি তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্রিয় হয়।

এ দায়িত্ব বর্তমানকালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে যথাসম্ভব পালন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যাকে উপরোক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূরা আন'আমের ১৫১ নং আয়াতের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে তার আলোচনা রয়েছে। তবু সংক্ষিপ্ত যেটুকু পুনরুল্লেখ এখানে প্রয়োজন, তা হলো সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তাকে হত্যা করা যায় না এবং স্বামীর শুককীট স্ত্রীর ডিম্বের সঙ্গে মিলিত হয়ে যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান লাভ করে, তারপরে তাকে গর্ভপাতের মাধ্যমে নিঃশেষ করাকেই সন্তান হত্যা হিসেবে অপরাধ ও নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, আধুনিক পদ্ধতিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের নীতি অবলম্বনের ব্যাপারে আধুনিক ফকীহদের মধ্যে মতামতের বিভিন্নতা রয়েছে। অনেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া শরীয়াহ সঙ্গত বলেননি।[১] আবার অন্যরা সঙ্গত বলে ধরেছেন।[২] আবার দেখা যায়, ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) ফিকাহ একাডেমীর কুয়েত বৈঠকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন, যে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ ইসলাম সম্মত।[৩]

চতুর্থত, সামগ্রিক প্রেক্ষিতে এবং জাতীয় আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে বর্তমানকালে অবস্থা বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, সম্পদের উদ্বৃত্ত আর জনসংখ্যার স্বল্পতা যে সব মুসলিম দেশে রয়েছে, সেখানে প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নয় বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উৎসাহ দান নীতি। দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতার এবং অতীতের উপনিবেশবাদী শোষণের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিতকরণ। তার জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে জন্মহার হ্রাস ইসলামী বিধান মতে সঙ্গত বলে অভিমতকেই সমর্থন করা যায়। তাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করে জাতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রমের অন্তর্গত করাই যুক্তযুক্ত। জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর অপব্যবহার করে সামাজিক দুর্নীতি ও বিবাহ বহির্ভূত যৌন স্বেচ্ছাচারের সুযোগ

www.pathagar.com

দিয়ে যেন অকল্যাণ সৃষ্টি না করা হয়, সে দিকে পূর্ণ সচেতনতাসহ মনোযোগ এবং কর্মপন্থা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. এ আলিমদের মধ্যে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য- *ইসলাম ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ।*

২. এঁদের মধ্যে ইউসুফ আল-কারদাভী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রকাশিত ইসলামে হালাল হারাম বিধান) হাম্মুদাহ আবদুল আতী The Family Structure in Islam, Published by American Trust Publications (USA) উল্লেখযোগ্য।

৩. দৈনিক ইনকিলাব ১৮/১২/৮৮ ইং তারিখে প্রকাশিত খবর।

8 Prof. Raihan Sharif, Islamic Economy: Concept of Rizq, Islamic Foundation Bangladesh, Publication 1986 (Vide chap. pp. 66-67, esp.) population discouragement (and hence reliance on fertility control) has in such cases to be integrated into the stategies of socio-economic department.

www.pathagar.com

সমুদ্রে যোগাযোগ ও আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে

رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ط اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا .

তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালনা করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার। তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা বনী ইসরাইল :৬৬)

আয়াতের প্রেক্ষিত

এ আয়াতের প্রেক্ষিত বুঝতে হলে এ রুকূর প্রাথমিক কথাগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। তাতে বলা হয়েছে যে, ইবলিস সৃষ্টির প্রথম দিন হতে মানব সন্তানের পেছনে লেগে আছে। সে তাদেরকে নানাবিধ আশা, আকাঙ্খা, কামনা, অভিলাষ ও মিথ্যা ওয়াদা এবং প্রতিশ্রুতির কুজ্ঝজালে বেঁধে সর্বদা নির্ভুল পথ হতে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে আসছে। সে প্রমাণ করতে চায় যে, মানুষ আল্লাহর দেয়া শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার যোগ্য নয়। এ বিপদ হতে মানুষকে যদি কোনো জিনিস... উদ্ধার করতে পারে তবে তা শুধু এই যে, মানুষ তার রবের বন্দেগীর উপর অবিচল থাকবে। হেদায়াত ও সাহায্যের জন্য কেবল তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এতদ্ব্যতীত আর যে পথই মানুষ গ্রহণ করবে, শয়তানের ফাঁকি ও ধোঁকা হতে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। এ আলোচনা হতে এ কথা স্বত:ই প্রমাণিত হয় যে, সব লোক তাওহীদের দাওয়াতকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে আর শিরক-এর উপর অবিচল থাকে, তারা... নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস সাধনে নিয়োজিত। এ সম্পর্কের কারণেই এখানে তাওহীদকে প্রমাণিত ও শিরককে বাতিল করা হয়েছে। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, ৮২ নং টীকা)

তাৎপর্য

এ আয়াতে সামুদ্রিক সফরের সাহায্যে যে সব অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফায়দা লাভ সম্ভব, সে দিকে ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র দেয়া যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্কে আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ পশু সম্পদ সৃষ্টি করেছেন, যা ভার বহনে ও যোগাযোগে সহায়তা দান করে থাকে। আজও অনেক উচ্চ স্থানে, বনে-জঙ্গলে ও মরুভূমিতে পশু যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে (সূরা নাহলের আয়াত নং ৫-৮-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য) এ আয়াতেও এ সূরারই ৭০ নং

www.pathagar.com

আয়াতে নৌযানের গুরুত্ব বোঝা যায়। বিশাল সমুদ্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলভাগকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নৌযানের মাধ্যমে এ সবের মধ্যে যোগাযোগ সংস্থাপন করা হয়। তেমনিভাবে মৎস্য ও অন্যান্য সম্পদ আহরণে নৌযানের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এ আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সমুদ্র...ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এ সব অনুসন্ধান করা মানুষের দায়িত্ব। অনুগ্রহ বলতে অনেক কিছু বোঝাতে পারে। প্রথমত, এর দ্বারা আল্লাহ্‌র দেয়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ বোঝানো যেতে পারে, যা আহরণ-অর্জন করে মানবজাতির প্রয়োজন মেটানো যায় এবং তাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা যায়। এর দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যে জ্ঞানভাণ্ডার ছড়িয়ে আছে (যা মানুষের কল্যাণকর), তা অর্জন করাও বোঝানো যায়।

এ আয়াতে এই ইশারাও পাওয়া যায় যে, সমুদ্রে সম্পদ আহরণে সব জাতির অধিকার রয়েছে। সে জন্য সমুদ্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে না রেখে আন্তর্জাতিক থাকাই সঙ্গত মনে হয়।

www.pathagar.com

আল্লাহর আনুগত্য প্রসঙ্গে

إِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً ط وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ * وَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ إِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ *

তোমাদের এই উম্মত প্রকৃতপক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। কিন্তু তারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে- সকলকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

(সূরা আম্বিয়া : ৯২-৯৩)

তাফসীরকারদের আলোচনা

এ প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী তার তাফসীরে লিখেছেন :

'তোমরা আমার ইবাদত কর' বলে সম্বোধন করা হয়েছে সমস্ত মানুষকে। বক্তব্য এই যে- হে মানুষ! তোমরা সকলেই আসলে এক উম্মত ও একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। দুনিয়ায় যত নবী-রাসূলই এসেছেন, তাঁরা সকলে একই দীন নিয়ে এসেছিলেন। আর সেই আসল দীন এই ছিল যে, একমাত্র আল্লাহই মানুষের রব এবং কেবল এক আল্লাহর পূজা-উপাসনা ও ইবাদত-আরাধনা করা আবশ্যক। উভয়কালে যত ধর্মমতই আবির্ভূত হয়েছে, তা এই মূল দীনকে ঠিক করে, রদ-বদল করে তৈরী করা হয়েছে।... একজন মূল দীন হতে একাংশ গ্রহণ করে তার সঙ্গে নিজের পক্ষ হতে আরো অনেক জিনিস যোগ করে এক নতুন ধর্মমতের রূপ দিয়েছে। এভাবে অসংখ্য মিল্লাত গড়ে উঠেছে। এখন একথা বলা হয় যে, অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রবর্তক, অমুক নবী অমুক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। মানব সমাজে এমন বহু ধর্ম ও বহু মিল্লাতের বিভেদ নবী-রাসূলগণ সৃষ্টি করেছেন বলা সম্পূর্ণ ভুল কথা। বিভিন্ন মিল্লাতের লোকেরা নিজেদেরকে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশের নবীর প্রবর্তিত ধর্ম প্রচার করছে বলেই এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, ধর্ম ও মিল্লাতের এ পার্থক্য নবী-রাসূলগণই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ প্রেরিত নবী-রাসূলগণ দশ রকমের ধর্ম প্রচার করেননি এবং এক আল্লাহ ছাড়া অপর কারো বন্দেগী করার দাওয়াত বা শিক্ষা দেননি।

(তাফহীমুল কুরআন, সূরা আম্বিয়ার তাফসীর নং ৯১)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ দুই আয়াতে অর্থনৈতিক তাৎপর্যের প্রত্যক্ষ কোনো কথা নেই। তবে পরোক্ষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। প্রথমত, ইবাদত একমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে।

www.pathagar.com

ইবাদতের অর্থ হচ্ছে আনুগত্য অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। এ আনুগত্য কেবল নৈতিক ও সামাজিক জীবনে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর দীনকে বা আল্লাহর নির্দেশকে টুকরো টুকরো করার কোনো অধিকার কারো নেই, অর্থাৎ এ কথা বলা অবৈধ যে, আল্লাহর এক নির্দেশ মানবো এবং অন্য নির্দেশ মানবো না। আল্লাহর নির্দেশ সর্বক্ষেত্রেই মানতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যেখানে যেখানে আল্লাহর নির্দেশ আছে, সেগুলোর সবটুকুই মানতে হবে। তৃতীয়ত, আল্লাহ হচ্ছেন রব অর্থাৎ প্রকৃত পালনকর্তা। অন্যেরা নিমিত্ত মাত্র। আল্লাহই প্রকৃত স্রষ্টা- মানুষের এবং সম্পদের। সুতরাং সে রবের নির্দেশের ভিত্তিতেই সব চলা উচিত এবং তাঁরই শুকরিয়া করা উচিত।

আলোচ্য আয়াতে আরো দু'টো বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, তোমাদের উম্মত একই উম্মত এবং আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। সবাই মিলে একই উম্মত হওয়ার ধারণা ব্যাপক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। দুনিয়া, সমগ্র মানুষ এবং তথাকথিত জাতিগুলো এক জোড়া মানব-মানবী থেকে উদ্ভূত। ফলে সকল জাতি মিলে দুনিয়ার সম্পদ সমভাবে ভাগ করে ভোগ-ব্যবহার করার ধারণা অপ্রাসঙ্গিক নয়। দুনিয়ার রাষ্ট্রসমূহ এমনভাবে গঠিত এবং সম্পদপূর্ণ, যেন পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ একটি বিশ্বজনীন অর্থনীতির ধারণা করা সম্ভব, যা ইসলামের সার্বজনীন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে কোনো ধর্ম বা তন্ত্র নেই। সব দীন বা তন্ত্রই জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছে। কিন্তু ইসলাম জীবনের সবগুলো দিককে নির্দেশ করে একটি সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করেছে। এই অবস্থায় অর্থনীতি ও দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, নৈতিক নীতিমালার উপর নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ *

তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, যাবতীয় ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং যাবতীয় অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণাম আল্লাহর হাতে। (সূরা হজ্জ : ৪১)

বিশেষ শব্দের অর্থ

মা'রূফ (معروف)মূল ধাতু معروف عرفان، معرفة عرف অর্থ পরিচিত, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, সৎকর্ম ইত্যাদি (আল-মুনজিদ ও মিসবাহ)। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ন্যায়, সৎ ও উৎকৃষ্ট বলে পরিচিত কর্ম বা বিষয়কে معروف বলে।

মুনকার (منكر) মূল ধাতু نكرة ، نكر অর্থ অস্বীকার, অপরিচিত, অজানা, ঘৃণা ইত্যাদি পরিভাষায় গৃহীত ও নিষিদ্ধ কর্ম এবং বিষয়কে منكر বলা হয়। অর্থাৎ যাবতীয় অকল্যাণকর ও অসৎ কর্ম 'মুনকার'-এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রেক্ষিত

৩৯ নং আয়াত হতে সূরা হজ্জের ষষ্ঠ রুকূ শুরু হয়েছে। রুকূর শুরুতে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এটি ছিল মদীনায় হিজরতের পর কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সর্বপ্রথম অনুমতি। বলা হয়েছে যে, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং যাদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে, তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো। তারপর যুদ্ধ সংক্রান্ত আল্লাহর একটি মূলনীতি উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ এক দল অন্য দলের প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করতেন তা হলো মসজিদ, গির্জা, উপাসনালয় যাতে আল্লাহর নাম লওয়া হয় তা সবই চুরমার করে দেয়া হতো। যুদ্ধ সংগঠনের এই কারণেই পূর্ববর্তী সব নবী ও উম্মতকে কাফিরদের মোকাবিলা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এরূপ না করা হলে কোনো মাযহাব ও ধর্মেরই অস্তিত্ব থাকত না। ইতোমধ্যে হিজরতের পর নবী করীম (স.)-এর নেতৃত্বে মদীনা সনদের মাধ্যমে কার্যত মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই ভিত্তিকে আরো সংহত এবং যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করার সুযোগ দানের জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করার অনুমতিও দেয়া হল। এখন ইসলামী রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব হবে তার উপর

www.pathagar.com

আলোকপাত করা প্রয়োজন। আর তাই দেখা যাচ্ছে ৪১ নং আয়াতে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তাফসীরবিদদের আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) লিখেছেন : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত ওসমান গনী (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার এই ইরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই কর্মীদের এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। খুলাফায়ে রাশিদীন ও মুহাজিরগণ এ আয়াতের বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাঁদের কর্ম ও স্ফীতি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা এ কাজেই ব্যবহার করেন। যাকাতের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন, সৎ কাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন। এ কারণেই আলিমগণ বলেন, এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, খুলাফায়ে রাশিদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্য পাত্র ছিলেন এবং তাঁদের আগমনে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তা সত্য, সঠিক, আল্লাহর ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল। (রূহুল মা'আনী)

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল ভিত্তিক দিক। কিন্তু বলা বাহুল্য, কুরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোনো বিশেষ ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে যায়, এ কারণেই তাফসীরবিদ দাহ্হাক বলেন : এ আয়াতে তাদের জন্যই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন থাকা কালে তাদের এমন সব কাজ আঞ্জাম দেয়া উচিত, যেগুলো খুলাফায়ে রাশিদীন তাদের যামানায় আনজাম দিয়েছিলেন। (কুরতুবী)

(মুফতী শফী (র) তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, ষষ্ঠ খণ্ড, সূরা হজ্জের তাফসীর অংশ থেকে)

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, তাঁর (আল্লাহর) সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভের অধিকারী লোকের গুণাবলী এই যে, তাদেরকে দুনিয়ায় শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করা হলে তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র আল্লাহ-দ্রোহিতা ও নাফরমানীর এবং অহংকার ও গৌরবের পরিবর্তে এই হবে যে, তারা সালাত কায়েম করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাদের ধন-সম্পদ বিলাসিতা, জাঁকজমক ও নফসের দাসত্বের কাজে ব্যয় হওয়ার পরিবর্তে যাকাত দানের কাজে

www.pathagar.com

ব্যয় হবে, তাদের সরকার যাবতীয় ন্যায় কাজকে দমন করার পরিবর্তে তাকে বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত হবে। তাদের ক্ষমতা অন্যায় ও পাপকে বিস্তার করার পরিবর্তে তাকে দমন করার কাজে ব্যবহৃত হবে। বস্তুত এই একটি বাক্য ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার কর্মধারা ও কর্মচারীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল কথা বলে দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র মূলত কি ধরনের রাষ্ট্র, তা কেউ বুঝতে চাইলে এই একটি আয়াত হতেই বুঝতে পারে।

(তাফহীমুল কুরআন, সূরা হজ্জের ৮৫ নং টিকা)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে এ আয়াতে মূলনীতি, দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে যাকাত কায়েম করা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এ গ্রন্থে পূর্বেই করা হয়েছে। অন্যদিকে এ আয়াতে 'মারূফের প্রতিষ্ঠা' ও 'মুনকারকে' নির্মূল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'মারূফ' বা সুনীতি এবং 'মুনকার' বা দুর্নীতি শব্দ দু'টির ব্যাপক নৈতিক সামাজিক, আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'আমরু বিল মারূফের' সঠিক প্রয়োগের অর্থ হবে সর্ববিধ উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং 'নাহি আনিল মুনকার'-এর তাৎপর্য অর্থনৈতিক অবিচারের সব উপায় ও পন্থা বন্ধ করা। অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েম ও জুলুমের অবসানের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব আইন তৈরী করতে পারে এবং তার প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা কুরআনের এ আয়াতে ইসলামী সরকারকে দান করা হয়েছে। অবশ্য কি ধরনের পন্থা ও উপায়ে জুলুম গণ্য করা হবে তা নির্ভর করবে ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের উপর। এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইসলামী সরকার সব ধরনের মুনাফাখোরী, মওজুদদারী, কার্টেল, মনোপলী ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে পারে।

এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় শরীয়াহ ও ইসলামী আইনের লক্ষ্য সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেমের মতামত উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহ তা'আলার সব নবী পাঠানো ও কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, যা গোটা সৃষ্টির মূলনীতি। আল্লাহর নাযিল করা প্রতিটি বিষয় এ কথা প্রমাণ করে যে, এসবের সত্যিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য ও ইনসাফ এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা।

আমরা তাই ন্যায়সঙ্গত সরকারী নীতি ও আইনকে শরীয়তের অংশ মনে করি, শরীয়তের বরখেলাফ হওয়া মনে করি না। এসবকে রাজনৈতিক নীতি বলা কেবল পরিভাষার ব্যাপার। আসলে এগুলো শরীয়তেরই অংশ। তবে শর্ত এই যে, এগুলোকে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

(ইলাম আল মুআক্কিন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯-১১)

www.pathagar.com

ইবনুল কাইয়্যেমের ভাষ্য অনুযায়ী ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের প্রতিটি বিভাগে ইনসাফ কায়েম করা। আলোচ্য আয়াতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম করার বিষয়টি ইসলামী সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিভাবে ইনসাফকে বাস্তবায়ন করা হবে, তা বিস্তৃত নীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের ব্যাপার। এই বিস্তৃত নীতিমালার পরিধি হিসেবে বলে দেয়া হচ্ছে যাবতীয় সৎ, সাবলীল ও উত্তম পদ্ধতি ও কর্মসমূহ সর্বোত্তম পন্থায় প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বপ্রকার না-হক, অসৎ, বাতিল ও বে-ইনসাফী, জুলুম, অপচয় ইত্যাদি উৎখাত ও বর্জন করা। অর্থনীতি ক্ষেত্রে 'মারূফ' প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে যাকাতের উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

এ আয়াতে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাও নিহিত রয়েছে বলা যায়। একটি কল্যাণ রাষ্ট্র সংগঠনে শুধু অর্থনৈতিক নীতি যথেষ্ট নয়। এ জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের আনুকূল্য। সালাত কায়েমের কথা বলে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহর আনুগত্য সম্পর্কিত

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ط هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لا مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ص فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ط هُوَ مَوْلٰكُمْ ج فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ *

আল্লাহর পথে জিহাদ কর- যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সঙ্কীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন। যা এ কুরআনেও তোমাদের এই নাম। যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকের জন্য। অতএব নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মাওলা-মনিব। তিনি বড়ই উত্তম মাওলা- বড়ই উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা হজ্জ :৭৮)

সাধারণ তাৎপর্য

পূর্বের ৭৭ নং আয়াতে ঈমানদারদের সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ ৭৮ নং আয়াতে নির্দেশসমূহও ঈমানদারদের লক্ষ্য করে দেয়া হয়েছে। আয়াতের সাধারণ তাৎপর্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহর নামে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। কেননা আল্লাহ মুসলিম জাতিকে তার কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। আল্লাহর কাজ হচ্ছে সারা বিশ্বে আল্লাহর বাস্তব সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ সবাই যেন বাস্তবে আল্লাহর আনুগত্য করে- এটাই হচ্ছে মুসলিমদের মিশন। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ দীনের মধ্যে অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। মুসলমানদেরকে ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে বলা হয়েছে। কেননা ইবরাহীমের দাওয়াত ও মিশন ইসলাম থেকে ভিন্ন ছিল না।

এখানে মুসলিম জনগণকে সমগ্র মানবতার জন্য সাক্ষী হতে বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে মুসলমানদেরকে সমগ্র মানবতার নিকট ইসলাম পৌঁছে দিতে হবে এবং সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ আয়াতে আল্লাহকে

www.pathagar.com

শক্তভাবে ধরার কথা বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, হিদায়ত কেবল আল্লাহর নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে, কেবল তাকেই ভয় করতে হবে, কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। অন্য সব আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের অধীন হবে।

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

'দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আল্লাহ চাপিয়ে দেননি'- এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফহীমুল কুরআনে সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন, 'তোমাদের যিন্দেগীকে সে সমস্ত অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় বাধা-বন্ধন হতে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যা অতীত উম্মতের উপর তাদের আইনবিদ, পীর, আলিম ও পোপেরা চাপিয়ে দিয়েছিল। এখানে যা চিন্তা ও কল্পনা গবেষণার উপর এমন কোনো নিয়ন্ত্রণ আছে যা জ্ঞান গবেষণার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হতে পারে না বাস্তব কর্মজীবনের উপর সে বিধি-নিষেধ আছে যা তমদ্দুন ও সমাজের উন্নতির পরিপন্থী। এক সহজ সরল আকীদা ও আইন বিধানেই তোমাদের দেয়া হয়েছে। এটি নিয়ে তোমরা যতদূর অগ্রসর হতে চাও অনায়াসেই হতে পার।' এ কথাটিই অন্য সূরার এক পর্বে বলা হয়েছে :

এই রাসূল তাদেরকে চেনা জানা নেক কাজের আদেশ করেন এবং সে সব খারাপ কাজ হতে বিরত রাখেন যা মানুষের প্রকৃতই খারাপ মনে করে। আর সেসব জিনিস হালাল করেন যা পাক ও পবিত্র এবং হারাম করেন সে সব জিনিস যা খারাপ। আর তাদের উপর হতে সে সব দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দেন, যা তাদের উপর চাপানো ছিল। সেই জিঞ্জিরগুলো খুলে ফেলেন যাতে তারা বন্দী ছিল।

(সূরা আ'রাফ : ১৫৭; তাফহীমুল কুরআন, সূরা হাজ্জ: ১৩০ টীকা)

মুফতী মুহাম্মদ শফী উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

'ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নেই' এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এ ধর্মে এমন কোনো গোনাহ নেই, যা তাওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আযাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় হতে পারে না।...

কেউ কেউ বলেন, সংকীর্ণতার অর্থ এমন সংকীর্ণতা, যা মানুষের পক্ষে অসহনীয়। এ ধর্মে কোনো বিধান নেই।

(মুফ্তী মুহাম্মদ শফী, সূরা হজ্বের ৭৮ নং আয়াতের তাফসীর হতে)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ আয়াতের অর্থনৈতিক তাৎপর্যবহ একটি কথা হচ্ছে- আল্লাহ পাক দ্বীনের ব্যাপারে কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। দীন-এর অন্যতম অর্থ হচ্ছে জীবন ব্যবস্থা। এ অর্থই এখানে যথাযথভাবে প্রযোজ্য। অন্য কথায়, আল্লাহ বলেন যে,

www.pathagar.com

মানুষ তার জীবনের কাজ-কর্মে অপ্রয়োজনীয় সংকীর্ণতা সৃষ্টি করুক বা বোঝা বহন করুক-যদি তা করা হয় তা হলে তা আল্লাহর মর্জি কার্যকর করা হবে না এবং আল্লাহর মর্জির বিপরীত কাজ করা হবে। এ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, অর্থনৈতিক জীবনেও তা রাষ্ট্রীয় হোক, কি ব্যক্তিগত- অহেতুক সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা ইসলামসম্মত কাজ হবে না; বরং তার বিপরীতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্র যদি অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-নিষেধ আরোপ করে, বিধি-নিষেধ প্রয়োগে যদি কঠোরতা দেখায়, অপ্রয়োজনীয় অযথা জনগণের সাধ্যাতীত কর ধার্য করে শিল্প উৎপাদন ও বাণিজ্যে যদি অহেতুক ও সমাজের উন্নতির পরিপন্থী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তা ইসলামের বিপরীত কাজ হবে। মূলকথা হলো-কঠোরতা পরিহার ও সহজতা অবলম্বন। এটাই ইসলামের অন্যতম প্রধান মূলনীতি, যার প্রয়োগ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে করতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন, 'তিনি তোমাদের জন্য সহজতা চান, কঠোরতা চান না' উল্লিখিত এ আয়াতে মানব জাতির জন্য মুসলিমদের সাক্ষ্য হওয়ার মধ্যে এ তাৎপর্যও অন্তর্ভুক্ত যে, ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালা পৃথিবীকে জানানো, সবখানে ছড়িয়ে দেয়া এবং তা কায়েম করাও মুসলিমদের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য, এ আয়াতে যাকাত দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ ও নিয়ামত প্রসঙ্গে

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ص وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ * فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ * وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ *

আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি, অত:পর আমি তা ভূভাগে সংরক্ষিত রেখেছি এবং আমি তা অপসারণ করলেও করতে পারি। আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় আছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্য থেকে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর এবং তাদের পিঠ ও জলযানে আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক। (সূরা মু'মিনুন : ১৮-২২)

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) লিখেছেন, মানুষের জীবনধারণের জন্য যেসব জিনিস অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশী হয়ে গেলে তার জন্য বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আযাব হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশী বর্ষিত হলে প্লাবন এসে যায়। ফলে আযাব নেমে আসে। তাই সবকিছু بِقَدَرٍ অর্থাৎ পরিমিতভাবে হয়।

অত:পর আল্লাহ বলেন, أَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে তা সংরক্ষণ করেছি। প্রাত্যহিক জীবনে যেভাবে যে স্থানে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু যেন পেতে পারে, সে জন্য পানির বিরাট অংশকে পাহাড়ের শৃঙ্গে বরফ হিসেবে রেখে দিয়েছি।

অত:পর আরবের রুচি অনুযায়ী কিছুসংখ্যক ফল-মূল যেমন আঙ্গুর, খেজুর, জলপাই ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। চতুষ্পদ জন্তুর দুধ, গোশত, লোম, অস্থি মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে উল্লেখ করেছি। উপকারের বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। মানুষ জন্তু-জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করে এবং মাল

www.pathagar.com

পরিবহণের কাজেও নিযুক্ত করে। অত:পর নৌকা ও চাকার মাধ্যমে চলে- এমন যানবাহনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

(মা'আরেফুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫-৩৭৬)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

আয়াত ক'টিতে আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ ও নিয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক বৃষ্টির সাহায্যে পৃথিবীকে জীবিত করেন এবং খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর এক বিরাট এলাকার অর্থনীতিতে খেজুর খাদ্য ও ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের কোনো কোনো অংশের কথা বলা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা জলপাই উৎপাদনের কথা বলেছেন, যা তেল হিসেবে এমনকি সবজি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কুরআনের অন্যান্য স্থানে অন্যান্য শস্যের উল্লেখ রয়েছে এবং এ সবই আল্লাহর দেয়া সম্পদ। আয়াতসমূহে এরপর চতুষ্পদ জন্তুসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে কোনো কোনোটির দুধ মানুষ পান করে থাকে। এসব জন্তু থেকে মানুষ অন্যান্য অনেক উপকারিতা পেয়ে থাকে। এসব পশুর মধ্যে অনেক পশুর গোশত মানুষ খেয়ে থাকে। সেগুলোর চামড়াও মানুষের কাজে লাগে। কিছু কিছু পশু ভারবাহী জন্তু ও যান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসবই আল্লাহর দেয়া নিয়ামত ও সম্পদ।

এছাড়া এসব আয়াতে আল্লাহ্ পাক জলযানের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্‌রই দেয়া গাছের কাঠ দিয়ে মানুষ এসব নৌকা তৈরী করে। আধুনিক যুগে মানুষ ইস্পাত দিয়ে বড় বড় জাহাজ তৈরী করছে। তাও আল্লাহর দেয়া আকরিক লৌহ দিয়ে। মানুষ তার পরিশ্রম দিয়ে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ সব যান তৈরী করছে। এসবও সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। মূলত মূল প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রযুক্তিগত সম্পদ মানের দিক দিয়ে একই রকম।

।এই অংশ মোহাম্মদ শামসুল আলম খান এবং শাহ আবদুল হান্নান কর্তৃক লিখিত।।

www.pathagar.com

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে

اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا *

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন না; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (সূরা ফুরকান :) ২

শব্দের তাৎপর্য

ملك সার্বভৌমত্ব, শাসন ক্ষমতার মহত্ত্ব, আইন বিধান তৈরীর অধিকার, বাদশাহী, সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

তাফসীর

তাফসীরে এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উদ্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন।

(মা'আরেফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর হতে)

তাফসীরকারদের আলোচনা

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী লিখেছেন : তিনি (আল্লাহ) কাউকেও পালক পুত্র বানাননি। বিশ্বলোকে এমন কেউ নেই, আল্লাহর সঙ্গে যার বংশীয় কিংবা পালকপুত্র হওয়ার সম্পর্কের কারণে তার মাবুদ হওয়ার অধিকার অর্জিত হবে। তাঁর সত্তা এক ও একক মাত্র। কেউ তাঁর সমজাতীয় বা সমপ্রজাতীয়ও নয়। খোদায়ী বংশ বলে কিছু নেই, আল্লাহর কোনো বংশের ধারাও চালু হয়নি। বহু ফেরেশতা, জ্বিন কিংবা কোনো মানুষকে আল্লাহর বংশধর বা সন্তান মনে করে নিয়েছে আর এ কারণে তাদেরকে দেবতা ও মাবুদরূপে গ্রহণ করেছে, তারা সকলেই পুরাপুরি জাহিল, পথভ্রষ্ট। অনুরূপভাবে তারাও সুস্পষ্ট মূর্খ ও গোমরাহীতে নিমজ্জিত, যারা বংশীয় সম্পদের কারণে না হলেও কোনো বিশেষ ধরনের বিশেষত্বের ভিত্তিতে মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে নিজের পুত্র বানিয়েছেন। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফুরকানের ৬ নং টীকা)

www.pathagar.com

'মুলক' শব্দটি আরবী ভাষায় বাদশাহী, সার্বভৌমত্ব ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সমগ্র বিশ্বলোকের অধিকারী; প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী- তথা ক্ষমতা ইখতিয়ারে অপর কারো একবিন্দু পরিমাণ অংশও নেই।
(তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল-ফুরকান)

আর্থ সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতের কোনো সরাসরি অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে বলা যায় না। কিন্তু এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মানবজাতির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। কেননা তিনিই একমাত্র সার্বভৌম শক্তি। সার্বভৌম শক্তিরই এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি মানব জাতির জন্য মৌলিক নীতি, আদর্শ আইন এবং দেবেন। বাস্তবেও আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সার্বভৌম শক্তি হওয়া সম্ভব নয়। মানুষ বা আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব শক্তিরই নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাদের পক্ষে চিরন্তন ও সবার জন্য কল্যাণকর নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এ জন্য ইসলামে মূল আইন আল্লাহ পাক দিয়েছেন। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে এ মূল আইন ও নীতিমালাকে কার্যকর করা। অবশ্য মানুষ ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তিত সময়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মূল আইনের অতিরিক্ত আইন ও মূল আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারে। সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ক নীতি নির্ধারণে এ আয়াত থেকে গ্রহণীয় আছে।

www.pathagar.com

বিয়ে প্রসঙ্গে

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

তোমাদের মধ্যে যারা জুড়িহীন, তাদের বিয়ে সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সম্পদশালী করে দেবেন, আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদের নিজ অনুগ্রহে সম্পদশালী না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মাঝে কল্যাণের সন্ধান পাও। আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদের দান করবে। তোমাদের দাসীরা সতিত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাদের ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য করো না, আর যে তাদের বাধ্য করে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের ওপর জবরদস্তির পরে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আন-নূর : ৩২-৩৩)

বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা

ايامى এক বচনে ايم অর্থ জুড়িহীন, (লিসানুল আরব) নারী ও পুরুষ উভয়ের বেলায় ব্যবহৃত।وليستعفف মূল ধাতু عفة পবিত্রতা, অনাবিলতা, নিষ্কলুষতা। উক্ত শব্দের অর্থ পবিত্রতা অর্জন করার প্রচেষ্টা।

তাফসীরকারদের আলোচনা وانكحوا الايامى منكم

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন : অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী যার বিয়ে বর্তমান নেই। আসলেই বিয়ে না করার কারণে হোক কিংবা বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের

www.pathagar.com

কারণে হোক। এমন নর ও নারীর বিয়ে সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদের আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিয়ে নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোনো পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিয়ের মাসনূন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিয়ে তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে- এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাবারও সমূহ আশংকা থাকে। এ কারণেই কোনো কোনো হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজেদের বিয়ে নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেয়া হয়েছে। তবে ইমাম আযমের মতে, এরূপ বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে।

যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্ম-কর্মের হিফাযতের জন্য বিয়ে করতে ইচ্ছুক কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হিফাযত ও সুন্নাতে রাসূলের ইতাআত করার সদুদ্দেশ্যে বিয়ে করবে, তখন আল্লাহ তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন।

(মাআরেফুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খন্ড, উক্ত আয়াতদ্বয়ের তাফসীর)

সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী তাফহীমুল কুরআনে লিখেছেন ·

ایامی বহু বচন। একবচনে ایم এর অর্থ জুড়িহীন। সাধারণত ایم বলতে বিধবাকে বোঝানো হয়ে থাকে। বস্তুত এর অর্থ স্বামী বা স্ত্রীহীন পুরুষ।

اَنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ · (সূরা নুরের ৫০ নং টীকা)

এর প্রকৃত অর্থ এই নয় যে, যারই বিয়ে সম্পন্ন হবে তাকেই আল্লাহ অনেক ধন-সম্পদ দান করবেন। বরং এর বক্তব্য এই যে, এ ব্যাপারে লোকেরা যেন খুব বড় হিসেবী হয়ে না দাঁড়ায়। এতে কন্যা পক্ষের প্রতি হিদায়াত হল কোনো ভালো স্বভাবচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি যদি তাদের ঘরে বিয়ের পয়গাম পাঠায় তবে কেবল তার দরিদ্র অবস্থা দেখেই যেন প্রত্যাখ্যান না করে। আর ছেলেমেয়ের প্রতি হিদায়াত হল- ছেলে এখনো খুব বেশী কামাই-রোজগার করছে না বলে তাকে যেন অবিবাহিত না রাখা হয়। মোটকথা, অধিক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যের আশায় বিয়ে-শাদীর ব্যাপারটাকে মুলতবী রাখা উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায়, শুধু বিয়ের কারণেই মানুষের আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে থাকে। দায়িত্ব মাথার ওপর এসে গেলে মানুষ স্বত:স্ফূর্তভাবেই অধিক পরিশ্রম করতে এবং আয় বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হয়। রুজি-রোজগারের ব্যাপারে স্ত্রীও সহযোগিতা করতে পারে এবং ব্যয়

www.pathagar.com

কাজটা তার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক সময় ভালো অবস্থাও খারাপ হতে পারে। খারাপ অবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে ভালো হতে পারে। (সূরা নূরের ৫৩ নং টীকা)

ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত : নবী করীম (স) বলেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করতে পারে, তার তা অবশ্যই করা উচিত। কেননা বিয়ে খারাপ দৃষ্টি থেকে আত্মাকে রক্ষা করার এবং পবিত্রতা রক্ষার বড় উপায়। আর যে তার সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার যৌন প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখে।' (সূরা নূরের ৫৪ নং টীকা)

বিয়ের অভিভাবকত্ব

উপরোক্ত আয়াতে দেখা যায় যে, অভিভাবকদের মাধ্যমে বিয়ে সম্পাদন করাই যথার্থ ইসলামী পন্থা। এ সম্পর্কে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।

এ ব্যাপারে সব ইমামই একমত যে, বিয়েতে বয়স্ক নারীর মতামত থাকতে হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

পূর্বে বিবাহিত এমন জুড়িহীন ছেলেমেয়ের বিবাহ হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে এবং পূর্বে অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ে হতে পারে না যতক্ষণ না তাদের স্পষ্ট অনুমতি পাওয়া যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

তবে বিয়েতে অভিভাবকদের সম্মতি বাধ্যতামূলক কিনা- এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদের মত হচ্ছে যে, কেবল মেয়ের অনুমতিতেই বিয়ে হতে পারে না, অভিভাবকদের অনুমতি লাগবে। ইমাম আবু হানীফা (র), যুফার, শাবী ও জুহরীর মত হচ্ছে যদি একজন নারী তার ওলী ছাড়াই বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলে এবং তা কুফু (বিয়েতে পাত্র ও পাত্রীর সমতা) অনুযায়ী সম্পন্ন হয় তবে তা জায়েয হবে।

(ইবন রুশদ, বাদিয়াতুল মুজতাহিদ, দ্বিতীয় খণ্ড)

এ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম মতবিরোধের মীমাংসা পর্যায়ে লিখেছেন, ওলীর মতে ও ছেলেমেয়েদের মতে বিয়ের ব্যাপারে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তখন ওলীর মতের উপর ছেলেমেয়ের মতেরই প্রাধান্য দেয়া যুক্তিযুক্ত যদি তা ভালো পাত্র বা পাত্রীর সঙ্গে হতে দেখা যায়। কেননা বিয়ে হচ্ছে তার, ওলীর নয়। আর বিয়ের বন্ধনজনিত যাবতীয় দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হয়, ওলীকে নয়। সূরা বাকারার ২৩৪ নং আয়াত থেকেও তা প্রমাণিত হয় :

www.pathagar.com

তাদের ইদ্দত পূর্ণ হলে পরে তাদের নিজেদের সম্পর্কে শরীয়ত মুতাবিক ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যে সিদ্ধান্তই তারা গ্রহণ করুক তাতে তোমাদের (ওলীদের) কোনো দায়িত্ব নেই। (মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম : পরিবার ও পারিবারিক জীবন)

এখানে কুরআনের অন্য অনেক আয়াতের মতো যারা অসহায় বা অসুবিধায় আছে তাদের সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে । যেমন বলা হয়েছে- যারা মুক্তির প্রয়াসী তাদের আর্থিক সাহায্য কর। এ নীতি সব স্থানেই এবং সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে।

পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করার মধ্যে তাৎপর্য রয়েছে যে, ইসলাম সব পেশাকে বৈধ মনে করে না। মানবতার জন্য অকল্যাণকর কোনো পেশাই ইসলামের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজে বর্তমানে কিছু কিছু পেশা হয়তো থাকবে না। অবশ্য তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট যুগের ইসলামী পণ্ডিতদের পরামর্শের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের উপর।

[এ আয়াতের ইশারা যদিও বিবাহিতা নারীদের ব্যাপারে, তথাপি একই নীতি অবিবাহিতা নারী ও পাত্রের জন্য প্রযোজ্য হতে কোনো বাধা নেই। (গ্রন্থকার)]

www.pathagar.com

আল্লাহই রিযিকদাতা

يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ط هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ صلے فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ *

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত কি কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছো? (সূরা ফাতির : ৩)

শব্দার্থ

فانى تؤفكون এর দুটো অর্থ : ১. তোমরা কোথায়- দূরে সরে যাচ্ছ ; ২. কেমন করে তোমরা সত্যকে অস্বীকার করছ। (সাফওয়াতুল বয়ান, পৃষ্ঠা ৫৪৯)

তাফসীরভিত্তিক আলোচনা

সূরা ফাতির মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এ সূরাতে মূলত তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতের তাফসীরে সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন :

অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ হইও না, অনুগ্রহ ভুলে যেও না, নিমকহারামী করো না। তোমরা যা কিছু পেয়েছ তা আল্লাহরই দেয়া, এ সত্যকে তোমরা ভুলে যেও না। অন্য কথায় এই বাক্যটি সাবধান করে দেয় এই বলে যে, যে লোকই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী ও পূজা-উপাসনা করে, কোনো নেয়ামত পেয়ে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো শোকর আদায় করে, তার যে কোনো একটি কাজই যে করবে, সে অতিবড় অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি।

(সূরা ফাতিরের ৫ নং টীকা, তাফহীমুল কুরআন, দ্বাদশ খন্ড)

আয়াতে এ কথাও প্রশ্ন করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কি কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে, আছে কোনো রিযিকদাতা? আল্লাহ নিজেই জবাব দিচ্ছেন : না, নেই, কারণ প্রকৃত ইলাহ হচ্ছেন কেবল আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং এ ব্যাপারে মানুষের ধোঁকা খাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

এ আয়াতের তাফসীরে সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে :

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে সতর্ক করছেন এবং তার একত্ব ও ইবাদতের তিনিই যে একমাত্র অধিকারী- এ বিষয়ে দলীল পেশ করছেন।

www.pathagar.com

সৃষ্টি ও রিযিক প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন তিনি একক, তেমনি ইবাদত পাবার বেলায়ও। সুতরাং অন্য কেউ তার শরীক হতে পারে না। অত:পর বলা হয়েছে, এ প্রমাণ পেশ করার পরও কি তোমরা অন্য কারো সামনে মাথা নত করবে? এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে?

(আল্লামা আযমী কৃত সংক্ষিপ্ত ইবনে কাসীর, পৃষ্ঠা ১৩৯, তৃতীয় খন্ড, ৭ম খন্ড)

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ রিযিক দেয় না। রিযিক কেবল আল্লাহই দেন। ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি যা নিরেট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত- তা হচ্ছে দুনিয়ার সব সম্পদ আল্লাহর সৃষ্টি করা। এ সম্পদ হতেই মানুষ সব প্রয়োজন পূরণ করে। এ জন্য মানুষকে সব সময় আল্লাহকে মেনে চলা উচিত। আল্লাহই হচ্ছেন ইলাহ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, যাকে মানা সবার কর্তব্য। তার বিধানই সঠিক। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু মানা হলে তা কেবল অকৃতজ্ঞতা এবং না শোকরই হবে না, তা হবে বিভ্রান্তি। আল্লাহকে না মানা হলে তা হবে বিপথে চালিত হওয়া, ধোঁকা খাওয়া, যেমনটি এখানে বলা হয়েছে। কেননা আল্লাহই সর্বযুগের সব মানুষের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দিতে পারেন। অন্য কোনো শক্তির পক্ষেই তা দেয়া সম্ভব নয়। তারাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের শক্তি সীমিত।

মানব সমাজকে এ জন্য আল্লাহর বিধান মুতাবিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে বিভ্রান্তি হতে মুক্ত হতে পারে। এ পথ অবশ্য কঠিন। কেননা সত্যের প্রতিবন্ধক হচ্ছে মানুষের নিজের নফ্স ও স্বার্থের দাসানুদাস বিভিন্ন শক্তি।

বস্তুত এ আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, আল্লাহ পাক যেমন মানুষের জৈবিক ও দৈহিক প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি ব্যবস্থা করেছেন তার নৈতিক ও আত্মিক প্রয়োজন মেটাবার। প্রথমটার ক্ষেত্রে যেমন তিনি একক ও অনন্য, তেমনি দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রেও। সামান্য একটু চিন্তা করলেই এ সত্য সবার সামনে সহজে পরিষ্কার হয়ে উঠে। এতে বিভ্রান্তির সামান্যতম অবকাশও নেই।

www.pathagar.com

আল্লাহর অনুগ্রহশীল ব্যক্তি সম্পর্কে

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ * وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ط إِنَّهُ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ *

যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কখনও লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

(সূরা ফাতির : ২৯-৩০)

শব্দের ব্যাখ্যা

كتاب : কিতাব-পুস্তক, বই। এখানে আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। সালাত-দোয়া, প্রার্থনা, ইসলামের পরিভাষায় রুকূ ও সিজদাসহ যে ইবাদত দিনে ৫ (পাঁচ) বার আদায় করা হয়। রিযিক-আয়, জীবনোপকরণ, দান, একজন অন্যজন থেকে যে সুবিধা পায়, ভরণপোষণ। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে বিভিন্ন স্থানে করা হয়েছে।

তিজারত : ব্যবসা-বাণিজ্য যাবতীয় আর্থিক লেনদেন।

তাবুরা শব্দটি بور থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিনষ্ট হওয়া।

তাফসীরকারদের ব্যাখ্যা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন : প্রথম গুণ হচ্ছে তিলাওয়াতে কুরআন। আয়াতে এমন লোকদের বোঝানো হয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কুরআন তিলাওয়াত করেন : اَلَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে নামায কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে 'গোপনে ও প্রকাশ্যে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য অধিকাংশ ইবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগিতার কারণে কখনো কখনো প্রকাশ্যে করাও জরুরী।

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ * تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ *

www.pathagar.com

এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মসমূহকে ব্যাপক অর্থে ও উদাহরণস্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সৎকর্মের তুলনা ব্যবসার সাথে এই অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে।

কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশংকা থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবসায়ের সাথে لَنْ تَبُوْرَ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, সর্বকালের এই ব্যবসায়ে লোকসান ও ক্ষতির কোনো আশংকা নেই।

তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই না, উপরন্তু আল্লাহ তাদের প্রতিদান ও সওয়াব পুরাপুরি দেয়ার পরও স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ধারণাতীত আরো বেশী দেবেন।

(মা'আরেফুল কুরআন, সূরা ফাতিরের উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের তাফসীর অংশ)

সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী লিখেছেন : لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

ঈমানদার লোকদের এই কাজকে (আল্লাহ) ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ব্যবসায়ে মানুষ নিজের মূলধন, শ্রম ও যোগ্যতা ব্যয় করে এই আশায় যে, কেবল মূলধনই ফেরত পাওয়া যাবে না, কেবল শ্রম, সময় ও ব্যয়ের মজুরীই পাওয়া যাবে না, অতিরিক্ত মুনাফাও কিছু পাওয়া যাবে। একজন মু'মিন ব্যক্তির এই কাজও ঠিক তেমনি। সে খোদার হুকুম পালন, বন্দেগী ও ইবাদতে এবং তাদের দীনের জন্য চেষ্টা সাধনা সংগ্রামে নিজের ধন-মাল, সময় ও মেহনত, যোগ্যতা এই আশায় বিনিয়োগ করেন যে, এইসব কিছুর পুরোপুরি মজুরীই শুধু পাওয়া যাবে না, আল্লাহ তা'আলা আরো অধিক দান করে তাকে ধন্য করবেন। তবে এই দুই প্রকারের ব্যবসায়ে অতি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। সেই পার্থক্য এই দিকদিয়ে যে, দুনিয়ার ব্যবসায়ে মুনাফার আশাই কেবল থাকে না, লোকসান ও দেউলিয়া হয়ে যাওয়ারও আশংকা থাকে। কিন্তু নিষ্ঠাবান বান্দা আল্লাহর সঙ্গে যে কারবার করে তাতে ক্ষতি-লোকসানের ভয় থাকে না। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফাতিরের ৫১ নং টীকা)

অর্থনৈতিক তাৎপর্য

এ আয়াতদ্বয়ে কুরআন তিলাওয়াত, নামায কায়েম করা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করার মতো ইবাদতের কাজকে ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এতে ইসলামে কেবল ব্যবসার বৈধতাই প্রমাণ করে না, ব্যবসার মর্যাদাও প্রমাণ করে। এই আয়াতকে ব্যবসায় লাভ-লোকসানের একটি মানদন্ড দেয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের লাভ-লোকসানের হিসাব কেবল দুনিয়ার লাভ-লোকসানের ভিত্তিতেই করা সংগত নয়। লাভ-লোকসানের পূর্ণ হিসাব পাওয়া যাবে যদি আখিরাতের লাভ-লোকসানকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়; বরং সত্য কথা হচ্ছে-

www.pathagar.com

আখিরাতের লাভ-লোকসানই সত্যিকার লাভ-লোকসান। আখিরাতে যদি ক্ষতি হয়, তা হলে দুনিয়ার লাভ কোনো লাভ বলে গণ্য হতে পারে না।

এ জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যথার্থ অর্থ ব্যবস্থার জন্য কেবল আইন কানুনের উপরই নির্ভর করা হয় না; সেখানে ঈমানদার মানুষ তৈরী করার পূর্ণ ব্যবস্থা থাকে। যারা তাদের কাজের ভিত্তিতে পায় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, তাদের দোয়া হচ্ছে : رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো। (সূরা বাকারা : ২০১)

এ জন্য ইসলামী অর্থনীতিতে মূল্যবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ আয়াতে ব্যয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ব্যয়কে আল্লাহর কিতাব পাঠ ও সালাত কায়েমের পাশাপাশি উল্লেখ করায় এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। অবশ্য কি ধরনের ব্যয় করতে হবে, সে বিষয়ে এখানে কোনো উল্লেখ নেই। তবে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করার কথা বলে একে শুধুমাত্র দানের মধ্যে সীমিত রাখা হয়নি। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র শিক্ষার আলোকে বলা যায় যে, অসহায় মানুষকে সাহায্য করার জন্য ব্যয় যেমন এর অন্তর্ভুক্ত (যা প্রধানত গোপনে করা হয়) তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়- এমন সব ধরনের ব্যয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে 'আনফাক্' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ জমা করে রাখার (hoarding) বিপরীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয়, বিনিয়োগ, ধার, যাকাত, সদকা, ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ব্যয়ের উপর কুরআনের অন্যত্রও গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। যে কোনো ব্যয়- তা দানই হোক অথবা বিনিয়োগই হোক কার্যকর চাহিদাকে বৃদ্ধি করবে। বিনিয়োগের জন্য ব্যয় কার্যকর যোগানকেও বৃদ্ধি করবে। আর দানের রয়েছে সামাজিক তাৎপর্য। তা এক ধরনের Transfer payment হলেও আয় বন্টনে অসমতা (inequity) কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া, জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভোগ ব্যয়ের গুণকে প্রভাব (multiplier effect) বিদ্যমান। সুতরাং সামগ্রিক অর্থনীতির স্বার্থে সুষ্ঠু ব্যয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ অপরিহার্য।

কুরআনে তাই এ বিষয়ে যথার্থ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কৃপণতাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই সাথে ব্যয়ের নামে অপব্যয়কেও ইসলাম গ্রহণ করেনি। ব্যয় হতে হবে যথার্থ। ইতোপূর্বে এ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

www.pathagar.com

আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ * مَاخَلَقْنٰهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ *

আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে কোনো কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করিনি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না। (সূরা দুখান : ৩৮-৩৯)

সাধারণ আলোচনা

সূরা দুখান মক্কাতে নাযিল হয়। এ দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক পৃথিবীকে অকারণে সৃষ্টি করেননি। পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী উদ্দেশ্যমূলকভাবে যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথাটি কুরআনের আরো বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আন'আমে বলা হয়েছে : 'তিনিই সত্যতা সহকারে (বিলহক) পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন।'

সূরা ইউসুফে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ এ সব (সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি) নিরর্থক সৃষ্টি করেননি।' (আয়াত ৫)

সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে : 'আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী কোনো কিছু আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' (আয়াত : ১৫)

সূরা আল-মু'মিনূনে বলা হয়েছে : 'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না?' (আয়াত-১১৫)

সূরা রূম-এ বলা হয়েছে : 'তারা কি তাদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী সব কিছু সত্য ভিন্ন অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি করেননি।' (আয়াত : ৮)

এ সব আয়াত থেকে বোঝা যায়, সৃষ্টির সবকিছু যথাযথ কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এটি ইসলামী চিন্তার একটি মৌলিক দিক এবং এটিই অতীব সত্য কথা।

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন :

বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদঘাটন করে। উদাহরণত এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ

www.pathagar.com

তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বোঝা যায়। কারণ যে মহাশক্তি এসব মহাসৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি নিশ্চয়ই এগুলোকে ধ্বংস করে পুনরায় অস্তিত্বে আনতে পারেন। এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়তাও বোঝা যায়। কারণ পরকালের প্রতিদানের ও শাস্তি না থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কান্ড-কারখানাই ভন্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং এরপর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেয়া। অন্যথায় সৎ ও অসৎ উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরী হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহর মাহাত্ম্যের পরিপন্থী। (মা'আরেফুল কুরআন, সূরা দুখানের তাফসীর অংশ দ্রষ্টব্য)

মাওলানা মওদূদী লিখেছেন :

এর তাৎপর্য হচ্ছে, যে ব্যক্তিই মৃত্যুর পরের জীবন ও পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কারের কথা অস্বীকার করে, সে আসলে এ বিশ্বলোককে একটি খেলনা ও এর সৃষ্টিকর্তাকে অবুঝ বালক মনে করে। এ কারণে সে এ মত দাঁড় করিয়েছে যে, মানুষ দুনিয়ার সব রকমের হুড়-হাঙ্গামা করে একদিন এমনি মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে। তার এ জীবনের ভালো বা মন্দ ফল কিছুই হবে না। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই দুনিয়া জাহান কোনো খেলোয়াড়ের খেলার সৃষ্টি নয় বরং এক মহাবিজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তার এক মহানির্মাণ। আর কোনো বিজ্ঞানীই অর্থহীন নিস্ফল কাজ করতে পারেন- তা ধারণা করা যায় না।

(তাফহীমুল কুরআন, সূরা দুখানের ৩৪ নং টীকা)

আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য

এ আয়াত দু'টি মানব জীবনের জন্য একটি মৌলিক দর্শন দান করেছে। এ দু'টি আয়াত যে মহাসত্যের কথা যোজন করছে, তা কেউ যথাযথভাবে বিশ্বাস করলে সে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। সে হয়ে উঠবে স্রষ্টা ও পরকালে গভীর বিশ্বাসী এবং যে স্রষ্টা ও পরকালে গভীর বিশ্বাসী হবে, তার আচরণ অন্যের মতো হবে না। সে সব কিছু করার সময় পরকালের কথা ও সৃষ্টির নিকট তার জবাবদিহির কথা মনে করবে। তার উপযোগের (utility) বলে গণ্য করবে। সে দুনিয়াতে কম পেলেও বা কষ্ট স্বীকার করতে হলেও সত্যের খাতিরে তা মেনে নেবে। সুতরাং ইসলাম যে নৈতিকতা ভিত্তিক অর্থনীতির পরিকল্পনা করেছে, তার জন্য এ ধরনের ব্যক্তি হওয়া যে একান্ত অপরিহার্য- তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সামাজিক জীবনেও এ ব্যক্তি দায়িত্বশীল হবে এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে- তা নি:সন্দেহে বলা যায়।

www.pathagar.com

তওবার পর নিয়ামত দান প্রসঙ্গে

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا * وَّيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهٰرًا *

তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। (সূরা নূহ : ১১-১২)

তাফসীরকারদের আলোচনা

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন :

এ আয়াতের প্রেক্ষিতে অধিকাংশ আলিম বলেন, গোনাহ থেকে তওবা ও ইস্তিগফার করলে আল্লাহ যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে রক্ষা করেন এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত হয়। কোথাও কোনো রহস্যের কারণে খেলাফও হয়; কিন্তু তওবা ইস্তিগফারের ফলে পার্থিব বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রচলিত রীতি। হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। (মা'আরেফুল কুরআন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭৭)

সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর তাফসীরে লিখেছেন :

কুরআন মজীদের বেশ কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহদ্রোহিতার আচরণ কেবল পরকালেই নয় এই দুনিয়ায়ও মানুষের জীবন সংকীর্ণ-দুর্বিষহ করে দেয়। পক্ষান্তরে কোনো ক্ষতি যদি আল্লাহর নাফরমানীর পরিবর্তে ঈমান, তাকওয়া ও খোদায়ী আইন বিধান মেনে চলার নীতি অবলম্বন করে, তা হলে কেবল পরকালেই নয়, দুনিয়ায়ও তার প্রতি অফুরন্ত নিয়ামতের বারি বর্ষণ শুরু করে।
(সূরা তাহা : ১২৪, সূরা মায়েদা : ৬১; সূরা হুদ : ৪২)

কুরআন মজীদের এ সব আদেশ উপদেশ অনুযায়ী একবার দুর্ভিক্ষকালে হযরত উমর (রা) বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বের হন এবং শুধু ইস্তিগফার করেই ক্ষান্ত হন। লোকেরা বলল, আমিরুল মুমিনীন! আপনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন না। উত্তরে বললেন, আমি আকাশমন্ডলের সেসব দুয়ারে ধাক্কা দিয়েছি, যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। অত:পর সূরা নূহ-এর ক'টি আয়াত পড়ে শুনালেন। (ইবন জরীর ও ইবন কাসীর) হযরত হাসান বসরীর সময়ও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। তার সম্মুখে এক ব্যক্তি এসে চরম অনাবৃষ্টির অভিযোগ করে। তিনি বলেন,

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাও। অন্য এক লোক দারিদ্র্যের কথা বলে। তৃতীয় এক ব্যক্তি বলল, আমার কোনো সন্তান হচ্ছে না। চতুর্থ ব্যক্তি বলল, আমার জমিতে ফসল খুব কম ফলে। হাসান বসরী (র) প্রত্যেককে একই জওয়াব দিতে লাগলেন। বললেন, আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত চাও। লোকেরা বলল, ব্যাপার কি? আপনি বিভিন্ন প্রকার সমস্যার একই ধরনের সমাধান, সকল রোগের একই মহৌষধ বলছেন। এর কারণ কি? তিনি এর জওয়াবে সূরা নূহ-এর এ ক'টি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

(তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূহের তাফসীর, টীকা নং ১২, সংশোধিত)

আর্থ সামাজিক তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নবুওয়াত জীবনের মক্কী অধ্যায়ের প্রথম ভাগে এ সূরা নাযিল হয়। সূরার ৮-১০ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ) কর্তৃক তাঁর সঙ্গীকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া, তাদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে বোঝানো এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাদেরকে ক্ষমা চাইতে আহবান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা ক্ষমা চাও এবং সংশোধিত হয়ে যাও, তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ বৃষ্টি দান করবেন, ধন-সম্পদ দিয়ে ধন্য করবেন। তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করবেন এবং ঝর্ণা প্রবাহিত করবেন।

এ কথা সত্য যে, আল্লাহ পাক অনেক সময় ঈমানদারদের কম সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করবেন (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৫)। কিন্তু সব সময়ই যে হবে এটা সত্য নয়। যেমন এ দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে। মুসলিম জাতি যখন সামগ্রিকভাবে ইসলাম অনুসরণ করেছে, তখন সাধারণত আল্লাহ পাক তাদেরকে মালামাল ও সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন। গত কয়েকশ' বছর যে মুসলমানদের অবস্থা সাধারণভাবে খারাপ তার কারণ অন্য। এ সময়ে মুসলিম জাতি যথাযথভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানের চর্চা করেনি, জিহাদের দায়িত্ব পালন করেনি, জাতি উন্নতির জন্য ব্যবসা ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে কাজ করা দরকার তা পুরোপুরিভাবে করেনি। এ সময়ে তারা ইসলামের পরিবর্তে সাধারণভাবে কুসংস্কারে লিপ্ত হয়েছে। তা না হলে কোনো কারণ নেই মুসলিম জাতির প্রতি আল্লাহ মেহেরবানী না করার।

তাফসীর অংশে হযরত উমর (রা) ও হযরত হাসান বসরীর (র) কাজের তাৎপর্য এ নয় যে, কেবল ক্ষমা চাইতে হবে, কোনো কাজ করতে হবে না; বরং এর তাৎপর্য হচ্ছে কাজও করতে হবে, ক্ষমাও চাইতে হবে।

www.pathagar.com

অভাবগ্রস্তদের দুঃখ দূর করা প্রসঙ্গে

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا * اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُوْرًا *

এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে যারা খাওয়ায় আর তাদেরকে বলে- কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি এবং তোমাদের নিকট হতে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা চাই না। (সূরা দাহ্‌র : ৮-৯)

শব্দ টীকা

لوجه الله সরাসরি অর্থ আল্লাহ তা'আলার চেহারার উদ্দেশ্যে। ভাবার্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অথবা তাঁর সৃষ্টির বৃহত্তর কল্যাণার্থে।

তাফসীরকারদের আলোচনা

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী এ দু'টি আয়াতের তফসীরে লিখেছেন :

মূলের শব্দ হলো على حبه বহুসংখ্যক তাফসীরকার এর তাৎপর্য করেছেন। খাবারের প্রতি তাদের মনের আকর্ষণ, লোভ এবং নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা এই লোকদের খাওয়ায়। ইবন আব্বাস ও মুজাহিদ বলেন, দরিদ্র লোকদিগকে খাওয়াবার আগ্রহ ও উৎসাহে তারা এ কাজ করে। আর হযরত ফুজাইল ইবন আয়াজ ও আবূ মাসুদ দারানী বলেন, 'তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসায় এরূপ করে।' আমাদের দৃষ্টিতে এটাই ঠিক। এর পরবর্তী বাক্য ''আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের খাওয়াই'-এ কথা সমর্থন করে।

(তাফহীমুল কুরআন, সূরা দাহ্‌র, টীকা ১১)

তিনি আরো লিখেন :

আলোচ্য আয়াতে 'কয়েদী' বলতে যে কোনো বন্দীকেই বোঝায়, সে কাফির হোক কিংবা মুসলমান, যুদ্ধবন্দী হোক কিংবা কোনো অপরাধের কারণে বন্দী।

(প্রাগুক্ত, টীকা নং ১২)

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) লিখেন :

উপরে বর্ণিত সৎ লোকদের গুণাবলীর মধ্যে এটাও অন্যতম গুণ যে, তারা নি:স্ব, ইয়াতীম ও বন্দীদের খাদ্য দান করেন। আয়াতে অংশের শব্দটির অর্থ

www.pathagar.com

'মা'আ' অর্থাৎ সত্ত্বেও। মর্মকথা হল এই যে, তারা নি:স্বদের খাদ্য দান করে থাকেন, যদিও এ খাদ্যে তাঁদের আসক্তি ও ভালোবাসা আছে। শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার প্রদান করে এমন নয়। দরিদ্র ও ইয়াতীমদের খাওয়ানো তো সওয়াবের কাজ এবং ইবাদত বলে প্রকাশ্যেই বোঝা যায়। বন্দীদের ব্যাপারে এমন কাজও ইবাদত। কেননা, বন্দী- সে মুসলিম হোক বা কাফির- তাকে সাহায্য করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করে তাও সওয়াব হবে; কেননা ইসলামের প্রাথমিক যুগে বন্দীদের খাওয়ানো ও সংরক্ষণ করা সাধারণ মুসলিমদের মাঝে বন্টন করতেন। যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের সাথে এ রূপ করা হয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃ ৬৩৮)

আর্থ সামাজিক তাৎপর্য

সূরা দাহর-এর শুরুতে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার জীবনের শুরুতে কিছুই ছিল না এবং ক্রমে সে শ্রবণ ও দৃষ্টিসম্পন্ন মানবে পরিণত হয়। আল্লাহ তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন, তার মন চাইলে শোকরগুযার বান্দা হিসেবে আল্লাহর পথে চলতে পারে অথবা অকৃতজ্ঞ কাফির হতে পারে। তারপর কাফিরদের শাস্তি ও সৎকর্মশীলদের গুণাবলী পর্যায়ে আলোচ্য আয়াত দু'টিতে কেবল আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টির জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীদের খাওয়াতে বলা হয়েছে।

ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের অভাব-দারিদ্র্য ও অসুবিধা দূর করার কথা কুরআনের বহু স্থানে বলা হয়েছে। কয়েদীদের কথা এ আয়াতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কুরআনে যে অর্থনৈতিক নীতিমালা পাওয়া যায় তার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে অভাবগ্রস্ত জনসমষ্টির অভাব-দু:খ দূর করা। এ প্রসঙ্গে সূরা কাসাসে একটি ব্যাপক নীতি বর্ণিত হয়েছে :

আমি ইচ্ছা করলাম যে, যারা দুনিয়াতে নির্যাতিত তাদের প্রতি মেহেরবানী করব, তাদের নেতৃত্ব দান করব, তাদেরকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করব এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাব। (সূরা কাসাস : ৫)

আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর করা প্রত্যেক মু'মিনের দায়িত্ব। সূরা দাহরের এ আয়াতদ্বয়েও ঐ মূলনীতির ব্যাখ্যা রয়েছে। এই নীতি কার্যকর করা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

এ দু'টি আয়াতে ইসলামের ব্যয়নীতির একটি দিক পাওয়া যায়। মুসলমানদের ব্যয় আল্লাহর ভালবাসায় হতে হবে। ব্যয়ের অন্যান্য লক্ষ্য যেমন তার উপরে থাকতে হবে আল্লাহর ভালবাসা। অর্থাৎ যাতে আল্লাহর মর্জি নেই,

www.pathagar.com

এমন কাজে ব্যয় করা যাবে না। তেমনিভাবে ইসলামী সমাজে ব্যক্তি ও সরকারকে এমন অনেক ব্যয় করতে হবে, যা আপাত:দৃষ্টিতে লাভজনক নয় কিন্তু যা করা মানবকল্যাণের দাবী।

বস্তুত ইসলামী অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা এমন একটি Comprehensive System যেখানে অর্থনীতির যাবতীয় বিষয় অর্থনৈতিকভাবে সুসমন্বিত করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার উৎপাদন প্রক্রিয়া (Production process)-এর সাথে যারা প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছেন, তাদের আবার এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত করার জন্য বিভিন্ন রকম পন্থা গৃহীত হয়েছে। দান-সাদকা, যাকাত ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে সক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়ে নানাভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতদ্বয়েও একইভাবে তা করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতদ্বয়ের বাহ্যিক রূপ আধ্যাত্মিক হলেও সমষ্টির দিক দিয়ে এগুলো অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যবহ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শাহ আবদুল হান্নান ১৯৩৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ শহরে মামা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারিবারিকভাবেই সম্ভ্রান্ত শাহ পরিবারের ঐতিহ্য বহন করে চলছেন। পৈতৃক নিবাস কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদিতে হলেও নেত্রকোনা, নারায়ণগঞ্জসহ ঢাকাতে পড়াশুনা করেন। ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক করার পর ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জগন্নাথ কলেজ থেকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মেধা তালিকায় ২য় স্থানসহ স্নাতক ডিগ্রী এবং ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থানসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন।

শাহ আবদুল হান্নান ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। কর্মজীবন শুরু করেন অর্থ বিভাগে। এরপর তিনি শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বিভাগের কালেক্টর, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক বিভাগের সদস্য, মূল্য সংযোজন কর বিভাগের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯৯৫ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের, ১৯৯৬ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগের এবং ১৯৯৭ সালে আভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। একই সাথে ১৯৯৭ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানও নিযুক্ত হন।

বর্তমানে তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান। তিনি কিছুদিন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ও দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের ঢাকা ক্যাম্পাসের প্রধানের পাশাপাশি মানারাত ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইবনে সিনা ট্রাস্ট, ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যালস, দারুল ইহসান ট্রাস্ট, মানারাত ট্রাস্ট, Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), Islamic Economic Research Bureau, রাবেতা আলমে ইসলামী বাংলাদেশ, আল্লামা ইকবাল সংসদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অধিকারী শাহ আবদুল হান্নান ছাত্রাবস্থা থেকেই পাঠ্য বিষয় ছাড়াও ইসলাম, ইতিহাস, বিশ্ব সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করেন। তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর, উসূলুল ফিকহ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়েও পারদর্শী। ইতোমধ্যে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। *সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম, নারী সমস্যা ও ইসলাম, ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা, Usul -Al-Fiqh, Social Laws of Islam* তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

আল-আমীন প্রকাশন